

কঙ্কাল

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলো খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদেরকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত-মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে সহসা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে যাঁহারা আমাদেরকে জানেন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহুল্য এবং যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে অনুেষণ করিয়া জানা যায় না।

অল্পদিন হইল একদিন রাত্রে কোনো কারণে অন্যত্র স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়।-- অনভ্যাসবশত ঘুম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গির্জার ঘড়িতে বড়ো বড়ো ঘন্টাগুলো প্রায় সব কটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের সেজ জ্বলিতেছিল সেটা প্রায় মিনিট-পাঁচেক ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপূর্বেই আমাদের বাড়িতে দুই-একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল, মনে হইল এই-যে রাত্রি দুই প্রহরে একটি দীপশিখা চিরান্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন আর মানুষের ছোটো ছোটো প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাৎ নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কঙ্কালের কথা মনে পড়িল। তাহার জীবিতকালের বিষয় কল্পনা করিতে করিতে সহসা মনে হইল, একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাতড়াইয়া আমার মশারির চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন

ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সে যেন কী খুঁজিতেছে, পাইতেছে না এবং দ্রুততর বেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম, সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে তাহাই দ্রুত পদশব্দের মতো শুনাইতেছে। কিন্তু, তবু গা হুম্‌হুম্‌ করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, ‘কেও’ পদশব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শুনিতে পাইলাম, ‘আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি’

আমি ভাবিলাম, নিজের কাল্পনিক সৃষ্টির কাছে ভয় দেখানো কিছু নয়-- পাশ-বালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মতো অতি সহজ সুরে বলিলাম, ‘এই দুপুর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ। তা, সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক?’

অন্ধকারে মশারির অত্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল, ‘বল কী। আমার বুকের হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল। আমার ছাঞ্চিশ বৎসরের যৌবন যে তাহার চারি দিকে বিকশিত হইয়াছিল-- একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না?’

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, ‘হাঁ, কথাটা সংগত বটে। তা, তুমি সন্ধান করো গে যাও। আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি’

সে বলিল, ‘তুমি একলা আছ বুঝি? তবে একটু বসি। একটু গল্প করা যাক। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে ছুঁ শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ তোমার কাছে বসিয়া আর-একবার মানুষের মতো করিয়া গল্প করি’

অনুভব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম, ‘সেই ভালো। যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা-কিছু গল্প বলো’

সে বলিল, ‘সব চেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি’

গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল-- ‘যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোটো ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে যমের মতো ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বঁড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইরূপ মনে হইত। অর্থাৎ, কোন্-এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বঁড়শিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিগ্ধগভীর জন্মজলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে-- কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিব্রাণ নাই। বিবাহের দুই মাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ-পরিতাপ করিলেন। আমার শিশুর অনেকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাস্ত্রিকেরা কহিলেন, শাস্ত্রে যাহাকে বলে বিষকন্যা এ মেয়েটি তাই। সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে-- শুনিতেছ ? কেমন লাগিতেছে’

আমি বলিলাম, ‘বেশ। গল্পের আরম্ভটি বেশ মজার’

‘তবে শোনো। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম আমার মতো রূপসী এমন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। তোমার কী মনে হয়’

‘খুব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই’

‘দেখ নাই ? কেন। আমার সেই কঙ্কাল। হি হি হি হি-- আমি ঠাট্টা করিতেছি। তোমার কাছে কী করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃতদন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না-- এবং সেই কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর এত লালিত্য, এত লাভণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড়ো বড়ো ডাক্তারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন

ডাক্তার তাঁহার কোনো বিশেষ বন্ধুর কাছে আমাকে কনক-চাঁপা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই, পৃথিবীর আর সকল মনুষ্যই অস্থি-বিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল, কেবল আমি সৌন্দর্যরূপী ফুলের মতো ছিলাম। কনক-চাঁপার মধ্যে কি একটা কঙ্কাল আছে ?

‘আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারি দিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনি সৌন্দর্যের ভঙ্গি নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম-- পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে এমন দুইখানি হাত। সুভদ্রা যখন অর্জুনকে লইয়া দৃপ্ত ভঙ্গিতে আপনার বিজয়রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার বোধ করি এইরূপ দুখানি অস্থূল সুডোল বাহু, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিখার মতো অঙ্গুলি ছিল।

‘কিন্তু আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নিরুপায় নিরুত্তর ছিলাম। এইজন্য পৃথিবীর সব চেয়ে তোমার উপর আমার বেশি রাগ। ইচ্ছা করে, আমার সেই যোলো বৎসরের জীবন্ত যৌবনতাপে উত্তপ্ত, আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মতো তোমার দুই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইয়া দিই, তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি’

আমি বলিলাম, ‘তোমার গা যদি থাকিত তো গা ছুঁইয়া বলিতাম, সে বিদ্যার লেশমাত্র আমার মাথায় নাই। আর তোমার সেই ভুবনমোহন পূর্ণযৌবনের রূপ রজনীর অন্ধকারপটের উপরে জাজ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অধিক বলিতে হইবে না।’

‘আমার কেহ সঙ্গিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছতলায় আমি একা বসিয়া ভাবিতাম, সমস্ত পৃথিবী আমাকেই ভালোবাসিতেছে, সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, বাতাস ছল করিয়া বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে

এবং যে তৃণাসনে পা দুটি মেলিয়া বসিয়া আছি তাহার যদি চেতনা থাকিত তবে সে পুনর্বীর অচেতন হইয়া যাইত। পৃথিবীর সমস্ত যুবাপুরুষ ঐ তৃণপুঞ্জরূপে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবর্তী হইয়া দাঁড়ায়াছে এইরূপ আমি কল্পনা করিতাম ; হৃদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।

‘দাদার বন্ধু শশিশেখর যখন মেডিকেল কলেজ হইতে পাস হইয়া আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ডাক্তার হইলেন, আমি তাঁহাকে পূর্বে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিয়াছি। দাদা অত্যন্ত অদ্ভুত লোক ছিলেন-- পৃথিবীটাকে যেন ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়-- এইজন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

‘তাঁহার বন্ধুর মধ্যে এক শশিশেখর। এইজন্য বাহিরের যুবকদের মধ্যে আমি এই শশিশেখরকেই সর্বদা দেখিতাম। এবং যখন আমি সন্ধ্যাকালে পুষ্পতরুতলে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম তখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষজাতি শশিশেখরের মূর্তি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত-- শুনিতেছে ? কী মনে হইতেছে’

আমি সনিশ্বাসে বলিলাম, ‘মনে হইতেছে, শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।’

‘আগে সবটা শোনো। একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

‘আমি জানালার দিকে মুখ করিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রুগ্ণ মুখের বিবর্ণতা যাহাতে দূর হয়। ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকিয়াই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন তখন আমি মনে মনে ডাক্তার হইয়া কল্পনায় নিজের মুখের দিকে চাহিলাম।

সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষৎক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ ; অসংযমিত চূর্ণকুস্তল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং লজ্জায় আনমিত বড়ো বড়ো চোখের পল্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

‘ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন, একবার হাতটা দেখিতে হইবে।

‘আমি গাভ্রাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সুগোল হাতখানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম তো আরো বেশ মানাইতা রোগীর হাত লইয়া নাড়ী দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতস্তত ইতপূর্বে কখনো দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে নাড়ী দেখিলেন। তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ বুঝিলেন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ী কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম। বিশ্বাস হইতেছে না?’

আমি বলিলাম, ‘অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখিতেছি না-- মানুষের নাড়ী সকল অবস্থায় সমান চলে না।’

‘কালক্রমে আরো দুই-চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানসসেভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষ-সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল।

‘আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় একগাছি বেলফুলের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।

‘কেন। আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃপ্তি হয় না। বাস্তবিকই হয় না। কেননা আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম এবং ভালোবাসিতাম এবং আদর করিতাম, অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মতো হু হু করিয়া উঠিত।

‘সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না ; যখন চলিতাম নত নেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের অঙ্গুলিগুলি পৃথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নূতন-পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে ; মধ্যাহ্নে জানলার বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিত, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, মাঝে মাঝে এক-একটা চিল অতিদূর আকাশে শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইত ; এবং আমাদের উদ্যানপ্রাচীরের বাহিরে খেলেনাওয়ালা সুর ধরিয়া ‘চাই খেলেনা চাই’ ‘চুড়ি চাই’

করিয়া ডাকিয়া যাইত, আমি একখানি ধব্ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম ; একখানি অনাবৃত বাহু কোমল বিছানার উপর যেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভঙ্গিতে কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন দুইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরম্ভ করতলের উপর চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে-- মনে করো এইখানেই গল্পটা যদি শেষ হয় তাহা হইলে কেমন হয়।

আমি বলিলাম, ‘মন্দ হয় না। একটু অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটুকু আপন মনে পূরণ করিয়া লইতে বাকি রাতটুকু বেশ কাটিয়া যায়।’

‘কিন্তু তাহা হইলে গল্পটা যে বড়ো গম্ভীর হইয়া পড়ে। ইহার উপহাসটুকু থাকে কোথায়। ইহার ভিতরকার কঙ্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত ক’টি মেলিয়া দেখা দেয় কই।

‘তার পরে শোনো। একটুখানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির একতলায় ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারখানা খুলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কী করিলে মানুষ সহজে মরে, এই-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডাক্তারির কথায় ডাক্তারের মুখ খুলিয়া যাইত। শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মতো হইয়া গেল। ভালোবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই পৃথিবীময় দেখিলাম।

‘আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে-- আর বড়ো বাকি নাই।’

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, ‘রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।’

‘কিছুদিন হইতে দেখিলাম ডাক্তারবাবু বড়ো অন্যমনস্ক এবং আমার কাছে যেন ভারি অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম তিনি কিছু বেশিরকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জুড়ি ধার লইলেন, রাত্রে কোথায় যাইবেন।

‘আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিয়া নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ দাদা, ডাক্তারবাবু আজ জুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছেন।

‘সংক্ষেপে দাদা বলিলেন, মরিতে।

‘আমি বলিলাম, না, সত্য করিয়া বলো-না।

‘তিনি পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খোলসা করিয়া বলিলেন, বিবাহ করিতে।

‘আমি বলিলাম সত্য নাকি!-- বলিয়া অনেক হাসিতে লাগিলাম।

‘অপ্পে অপ্পে শুনিলাম এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন। ‘কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য কী। আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক ফাটিয়া মরিব। পুরুষদের বিশ্বাস করিবার জো নাই। পৃথিবীতে আমি একটিমাত্র পুরুষ দেখিয়াছি এবং এক মুহূর্তে সমস্ত ধন লাভ করিয়াছি।

‘ডাক্তার রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে আসিলে প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, কী ডাক্তার মহাশয়! আজ নাকি আপনার বিবাহ ?

‘আমার প্রফুল্লতা দেখিয়া ডাক্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারি বিমর্ষ হইয়া গেলেন।

‘জিজ্ঞাসা করিলাম, বাজনা-বাদ্য কিছু নাই যে ?

‘শুনিয়া তিনি ঈষৎ একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের।

‘শুনিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও তো কখনো শুনি নাই। আমি বলিলাম, সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই।

‘দাদাকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম যে দাদা তখনই রীতিমত উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

‘আমি কেবলই গল্প করিতে লাগিলাম বধু ঘরে আসিলে কী হইবে, কী করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম-- আচ্ছা ডাক্তার মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বেড়াইবেন। হি হি! হি হি! হি হি! যদিও মানুষের বিশেষত পুরুষের, মনটা দৃষ্টিগোচর নয়, তবু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি কথাগুলি ডাক্তারের বুকে শেলের মতো বাজিতেছিল।

‘অনেক রাত্রে লগ্না সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই-এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাসটুকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

‘আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম, ডাক্তারমশায় ভুলিয়া গেলেন নাকি। যাত্রার যে সময় হইয়াছে।

‘এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যিক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তারখানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সুবিধামত অলক্ষিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম।

‘কোন গুঁড়া খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

‘ডাক্তার এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র গদগদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মর্মান্তিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তবে চলিলাম।

‘বাঁশি বাজিতে লাগিল, আমি একটি বারাগসী শাড়ি পরিলাম, যতগুলি গহনা সিঁদুকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম-- সিঁথিতে বড়ো করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

‘বড়ো সুন্দর রাত্রি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেল ফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘর-দুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারি দিক হইতে মায়ার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি নেত্র নিম্নলন করিয়া হাসিলাম।

‘ইচ্ছা ছিল যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিটুকু যেন রঙিন নেশার মতো আমার চোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল যখন আমার অনন্ত-রাত্রির বাসরঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিটুকু এখান হইতেই মুখে করিয়া লইয়া যাইব। কোথায় বাসরঘর। আমার সে বিবাহের বেশ কোথায়। নিজের ভিতর হইতে একটা খট্‌খট্‌ শব্দে জাগিয়া দেখিলাম, আমাকে

লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে বুকের যেখানে সুখদুঃখ ধুক্‌ধুক্‌ করিত এবং যৌবনের পাপড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইত সেইখানে বেত্র নির্দেশ করিয়া কোন্ অস্থির কী নাম মাস্টার শিখাইতেছে আর সেই-যে অন্তিম হাসিটুকু ওষ্ঠের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলে কি--

‘গল্পটা কেমন লাগিল’

আমি বলিলাম, ‘গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর’

এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘এখনো আছ কি’

কোনো উত্তর পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

ফাল্গুন, ১২৯৮

মুক্তির উপায়

১

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গভীর প্রকৃতি। বৃদ্ধসমাজে তাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম, এবং হাস্যপরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গভীর, তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারি দিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ংকর উঁচু দরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গৌফ-দাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিস্ত। সে বন্ধিমবাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুশি ভালোবাসে, এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয় সেও তেমনি এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যমোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু, স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্গীতা শুনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না। যেদিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে কৃষ্ণকান্তের উইল বাহির হয় সেদিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হয়। একে নভেল-পাঠ, তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা। যাহা হউক, অবিশ্রান্ত আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেলে পিতার তাড়নায়

এতবড়ো গম্ভীরপ্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্মের উমেদারিতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম জুটিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন সে মনে করিল, ‘বুদ্ধদেবের মতো আমি সংসার ত্যাগ করিবা’ এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

২

মধ্যে আর-একটি ইতিহাস বলা আবশ্যিক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠীচরণের এক ছেলো। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সম্ভানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর-একটি বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাঁহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতান্ত শৌখিন এবং চপলপ্রকৃতি, কোনোপ্রকার গুরুতর কর্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে তো ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝাঁকা মারিতে লাগিল, তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাত্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখনো কখনো শুনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর-একটি বিবাহ করিয়াছে ; শুনা যায়, হতভাগ্য কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছে কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

৩

কিছুদিন ঘুরিতে ঘুরিতে উদাসীন ফকিরচাঁদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথপার্শ্ববর্তী এক বটবৃক্ষতেলে বসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, ‘আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। দারাপুত্র ধনজন কেহ কারো নয়। কা তব কাস্তা কস্তে পুত্রং?’ বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিল--

শোন্ রে শোন, অবোধ মন,
শোন্ সাধুর উক্তি - কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর গ্রহণ।
ভবের শক্তি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর অন্বেষণ।
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রো।

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল-- ‘ও কে ও বাবা দেখছি! সন্ধান পেয়েছেন বুঝি!
তবেই তো সর্বনাশ। আবার তো সংসারের অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাবেন। পালাতে
হলা’

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী এক গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ গৃহস্থামী চুপচাপ
বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কে
হে তুমি’

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এসো দেখি।

এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখেরঞ্চপরে ঝুঁকিয়া
বুড়ামানুষ বহুকষ্টে যেমন করিয়া পুঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ
নিরীক্ষণ করিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল-- ‘এই তো আমার সেই
মাখনলাল দেখছি। সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদলেছে, আর সেই
চাঁদমুখ গৌঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে’

বলিয়া বৃদ্ধ সস্মেন্ধে ফকিরের শ্মশ্রুত মুখে দুই-একবার হাত বুলাইয়া লইল
এবং প্রকাশ্যে কহিল, ‘বাবা মাখন’

বলা বাহুল্য বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠীচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম তো মাখন নয়। পূর্বে আমার নাম যাই থাক্, এখন আমার নাম চিদানন্দস্বামী। ইচ্ছা হয় তো পরমানন্দও বলতে পারো।

যষ্ঠী। বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল্ আর পরমান্নই বল্, তুই যে আমার মাখন, বাবা, সে তো আমি ভুলতে পারব না-- বাবা, তুই কোন্ দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি। তোর কিসের অভাব। দুই স্ত্রী-- বড়োটিকে না ভালোবাসিস, ছোটোটি আছে। ছেলেপিলের দুঃখও নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলো। আর আমি, বুড়াবাপ কদিনই বা বাঁচব-- তোর সংসার তোরই থাকবে।

ফকির একেবারে আঁতকিয়া উঠিয়া কহিল, ‘কী সর্বনাশ। শুনলেও যে ভয় হয়।’

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, ‘মন্দ কী, দিন-দুই বৃদ্ধের পুত্রভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক্ তাহার পরে সন্ধ্যানে অকৃতকার্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিবা’

ফকিরকে নিরন্তর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, ‘ওরে ও কেষ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয় গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।’

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল, সেই বটো কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু, বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত বগ্ৰা যে সন্দিগ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ার চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারকে সতেরো অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোনোমতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াসুদ্ধ লোকে আরাম পায়-- তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না, আশ্চর্য গল্প শুনিয়া যখন সকলের

তাক লাগিয়া গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু, ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বুড়া বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাড়না খাইয়া সংশয়ীর দল থামিয়া গেল।

ফকিরের অতিভীষণ অটল গান্ধীর্যের প্রতি দ্রুতপমাত্র না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, ‘আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েছেন, তপিস্থি হয়েছেন, চিরটা কাল ইয়াকি দিয়ে কাটালে, আজ হঠাৎ মহামুনি জামদগ্নি হয়ে বসেছেন’

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, নিরুপায়ে সহ্য করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘ওরে মাখন, তুই কুচকুচে কালো ছিলি, রঙটা এমন ফর্সা করলি কী করে!’

ফকির উত্তর দিল, ‘যোগ অভ্যাস ক’রে’

সকলেই বলিল, ‘যোগের কী আশ্চর্য প্রভাব!’

একজন উত্তর করিল, ‘আশ্চর্য আর কী। শাস্ত্রে আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুলতে গেলেন, কিছুতেই তুলতে পারলেন না। সে কী ক’রে হল। সে তো যোগ-বলো’

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষষ্ঠীচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল, ‘বাবা, একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্ছে’

এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই-- হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো মস্তিস্ক প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায্য পরিহাস পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল, ‘বাবা, আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, আমি অন্তঃপুরে ঢুকতে পারব না’

ষষ্ঠীচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, ‘তা হলে আপনাদের একবার গা তুলতে হচ্ছে। বউমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তাঁরা বড়ো ব্যাকুল হয়ে আছেন’

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল, এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি। কিন্তু, রাস্তায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুক্করের মতো তাহার পশ্চাতে ছুটিবে ইহাই কল্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তদ্ধভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেমনি মাখনলালের দুই স্ত্রী প্রবেশ করিল ফকির অমনি নতশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, ‘মা, আমি তোমাদের সন্তান’

অমনি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত খড়্গের মতো খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল, ‘ওরে ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বললি কাকে!’

অমনি আর-একটি কণ্ঠ আরো দুই সুর উচ্চে পাড়া কাঁপাইয়া ঝংকার দিয়া উঠিল, ‘চোখের মাথা খেয়েছিস! তোর মরণ হয় না!’

নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপ চলিত বাংলা শোনা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফকির জোড়হস্তে কহিল, ‘আপনারা ভুল বুঝছেন। আমি এই আলোতে দাঁড়াছি, আমাকে একটু ঠাউরে দেখুন!’

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল, ‘ঢের দেখেছি। দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙেছে। তোমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে। তোমায় যম ভুলেছে বলে কি আমরা ভুলব।’

এরূপ এক-তরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না-- কারণ, ফকির একেবারে বাকশক্তিহীন হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া যষ্ঠীচরণ প্রবেশ করিল। বলিল, ‘এতদিন আমার ঘর নিস্তদ্ধ ছিল, একেবারে টুঁ শব্দ ছিল না। আজ মনে হচ্ছে বটে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।’

ফকির করজোড়ে কড়িল, ‘মশায়, আপনার পুত্রবধূদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।’

যষ্ঠী। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ, তাই প্রথমটা একটু অসহ্য বোধ হচ্ছে। তা, মা তোমরা এখন যাও। বাবা মাখন তো এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্ছি নো।

ললনাদ্বয় বিদায় হইলে ফকির যষ্ঠীচরণকে বলিল, ‘মশায়, আপনার পুত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে গেছেন তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারছি। মশায়, আমার প্রণাম জানবেন, আমি চললেম।’

বৃদ্ধ এমনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে, পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল, এমন ভণ্ডতপস্বীগিরি এখানে খাটিবে না। ভালোমানুষের ছেলের মতো কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল, ‘ইনি তো পরমহংস নন, পরম বকা’

গাভীর্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন-সকল কুৎসিত কথা কখনো শুনিতে হয় নাই। যাহা হউক, লোকটা পাছে আবার পালায় পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার যষ্ঠীচরণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

৬

ফকির দেখিল এমনি কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল –

শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি

সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহুল্য, গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন করিয়াও কোনোমতে দিন কাটিত। কিন্তু মাখনের আগমনসংবাদ পাইয়া দুই স্ত্রীর সম্পর্কের এক ঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমত ফকিরের গৌঁফদাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল ; তাহারা বলিল, এ তো সত্যকার গৌঁফদাড়ি নয়, ছদ্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে।

নাসিকার নিম্নবর্তী গুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ লোকেরও মহাত্ম্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল-- প্রথমত মলিয়া, দ্বিতীয়ত এমন-সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কান না মলিলেও কান লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন-সকল গান ফর্মায়েশ করিতে লাগিল, আধুনিক বড়ো বড়ো নূতন পণ্ডিতেরা যাহার কোনোরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বপ্নাবশিষ্ট গণ্ডস্থলে চুনকালি মাখাইয়া দিল ; আহারকালে কেসুরের পরিবর্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্তে ছঁকার জল, দুধের পরিবর্তে পিঠালি-গোলার আয়োজন করিল ; পিঁড়ার নীচে সুপারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল ; লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অভভেদী গাভীর্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ফকির রাগিয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ঝাঁকিয়া-হাঁকিয়া কিছুতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। কেবল সর্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত ; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন দ্বিগুণ অধৈর্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষষ্ঠীচরণ কোনো-এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশুড়ির দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুটুম্ববাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরমকৌতুকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎকাল হৈমবতীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন, আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাটার সম্পর্কীয় লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত, কিন্তু স্নেহের সম্পর্কীয় লোকদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে এক দণ্ড ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল, উভয়েরই চেষ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল-- দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখচুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তিকার্যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্তস্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না। শিশুরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধুত্বের নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এইজন্য ফকির শিশুজাতির প্রতি তিলমাত্র অনুরক্ত ছিলেন না-- তাহাদিগকে তিনি কীট-পতঙ্গের ন্যায় দেহ হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশু-পঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জহিস অক্ষরের ছোটো বড়ো নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল এবং তাহারা সকলেই কিছু তাঁহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যজনেচিত ব্যবহার করিত না ; শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্রু নহে।

পরের ছেলেরা যখন নানা সুরে তাঁহাকে ‘বাবা’ ‘বাবা’ করিয়া ডাকিয়া আদর করিত তখন তাঁহার সাংঘাতিক পাশব শক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চম্ফু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

অবশেষে ফকির মহা চেষ্টামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, ‘আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে’

তখন গ্রামের লোক এক উকীল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকিল আসিয়া কহিল, ‘জানেন আপনার দুই স্ত্রী?’

ফকির। আজ্ঞে, এখানে এসে প্রথম জানলুম।

উকিলা আর, আপনার সাত মেয়ে, এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্য।

ফকির। আজ্ঞে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন দেখতে পাচ্ছি।

উকিলা। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি নেন তবে আপনার অনাথিনী দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, পূর্বে হতে বলে রাখলুম।

ফকির সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল, উকিলেরা জেরা করিবার সময় মহাপুরুষদিগের মানমর্যাদা গান্ধীর্ষকে খাতির করে না-- প্রকাশ্যে অপমান করে এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট বাহির হয়। ফকির অশ্রুসিক্তলোচনে উকিলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিল ; উকিল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিতবুদ্ধির, তাহার মিথ্যা-গল্প-রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শুনিয়া ফকিরের আপন হস্তপদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

যষ্ঠীচরণ ফকিরকে পুনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া অজস্র গালি দিল এবং উকিল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহার উপর যখন আটজন বালক বালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারি দিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল, তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণবাবু আসিয়া উপস্থিত। পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকিল কিছুতেই দখল ছাড়ে না।

এ লোকটি যে ফকির নহে, মাখন, তাহারা তাহার সহস্র অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিল-- এমন-কি যে ধাত্রী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই বুড়িকে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ

নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল, তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির এবং শিশুরা ঘরে রহিল।

দুই স্ত্রী হাত নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়ারে যাবার ইচ্ছে হয়েছে?’

ফকির তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, সুতরাং নিরন্তর হইয়া রহিল। কিন্তু, ভাবে যেরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোনো বিশেষ দ্বারের প্রতি তাহার যে বিশেষ পক্ষপাত আছে এরূপ বোধ হইল না ; আপাতত যে-কোনো একটা দ্বার পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়।

তখন আর-একটি রমণীমূর্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল। ফকির প্রথমে অবাক, তাহার পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল, ‘এ যে হৈমবতী!’

নিজের অথবা পরের স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্বে কখনো প্রকাশ পায় নাই মনে হইল, মূর্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

আর-একটি লোক মুখের উপর শাল মুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপরিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া সে এতক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল ; অবশেষে হৈমবতীকে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিল উক্ত নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভগ্নীপতি ; তখন দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ‘না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক’ দুই স্ত্রীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, ‘এ আমারই দড়ি, আমারই কলসী’ মাখনলালের এই অসাধারণ মহত্ব ও বীরত্বে পাড়ার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল।

ত্যাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। পুষ্করিণীতীরের একটি পুরাতন লিচুগাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অশ্রাস্ত পাপিয়ার গান মুখুজ্যেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। হেমন্ত কিছু চঞ্চলভাবে কখনো তার স্ত্রীর একগুচ্ছ চুল খোঁপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া আঙুলে জড়াইতেছে, কখনো তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠুং ঠুং শব্দ করিতেছে, কখনো তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া স্বস্থানচ্যুত করিয়া তাহার মুখের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তন্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন একবার এপাশ হইতে একবার ওপাশ হইতে একটু-আধটু নাড়াচাড়া করিতে থাকে, হেমন্তের কতকটা সেই ভাব।

কিন্তু কুসুম সম্মুখের চন্দ্রালোকপ্লাবিত অসীম শূন্যের মধ্যে দুই নেত্রকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। স্বামীর চাঞ্চল্য তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। অবশেষে হেমন্ত কিছু অধীরভাবে কুসুমের দুই হাত নাড়া দিয়া বলিল, “কুসুম, তুমি আছ কোথায়? তোমাকে যেন একটা মস্ত দুরবীন কষিয়া বিস্তর ঠাहर করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে এমন দূরে গিয়া পড়িয়াছ। আমার ইচ্ছা, তুমি আজ একটু কাছাকাছি এসো। দেখো দেখি কেমন চমৎকার রাত্রি!”

কুসুম শূন্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল, “এই জ্যোৎস্নারাত্রি, এই বসন্তকাল, সমস্ত এই মুহূর্তে মিথ্যা হইয়া ভাঙিয়া যাইতে পারে এমন একটা মন্ত্র আমি জানি।”

হেমন্ত বলিল, “যদি জান তো সেটা উচ্চারণ করিয়া কাজ নাই। বরং এমন যদি কোনো মন্ত্র জানা থাকে যাহাতে সপ্তাহের মধ্যে তিনটে চারটে রবিবার

আসে কিংবা রাত্রিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা পর্যন্ত টাঁকিয়া যায় তো তাহা শুনিতে রাজি আছি” বলিয়া কুসুমকে আর-একটু টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল। কুসুম সে আলিঙ্গনপাশে ধরা না দিয়া কহিল, “আমার মৃত্যুকালে তোমাকে যে-কথাটা বলিব মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে, তুমি আমাকে যত শাস্তি দাও-না কেন আমি বহন করিতে পারিবা”

শাস্তি সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শ্লোক আওড়াইয়া হেমন্ত একটা রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময় শোনা গেল একটা ক্রুদ্ধ চটিজুতার চটাচট শব্দ নিকটবর্তী হইতেছে। হেমন্তের পিতা হরিহর মুখজ্যের পরিচিত পদশব্দ। হেমন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

হরিহর দ্বারের নিকট আসিয়া ক্রুদ্ধ গর্জনে কহিল, “হেমন্ত, বউকে এখনই বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও” হেমন্ত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল, স্ত্রী কিছুই বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল দুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত বল এবং ইচ্ছা দিয়া আপনাকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিল। দক্ষিণে বাতাসে পাপিয়ার স্বর ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কাহারো কানে গেল না। পৃথিবী এমন অসীম সুন্দর অথচ এত সহজেই সমস্ত বিকল হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেমন্ত বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, “সত্য কি”

স্ত্রী কহিল, “সত্য”

“এতদিন বল নাই কেনা”

“অনেকবার বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, বলিতে পারি নাই। আমি বড়ো পাপিষ্ঠা”

“তবে আজ সমস্ত খুলিয়া বলো”

কুসুম গভীর দৃষ্টিতে সমস্ত বলিয়া গেল-- যেন অটলচরণে ধীরগতিতে আগুনের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল, কতখানি দন্ধ হইতেছিল কেহ বুঝিতে পারিল না। সমস্ত শুনিয়া হেমন্ত উঠিয়া গেল।

কুসুম বুঝিল, যে-স্বামী চলিয়া গেল সে-স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইবে না। কিছু আশ্চর্য মনে হইল না ; এ ঘটনাও যেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মতো অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থিত হইল ; মনের মধ্যে এমন একটা শুষ্ক অসাড়তার সঞ্চার হইয়াছে কেবল পৃথিবীকে এবং ভালোবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল। এমন-কি, হেমন্তের সমস্ত অতীত ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা খরধার নিষ্ঠুর ছুরির মতো তাহার মনের একধার হইতে আর একধার পর্যন্ত একটি দাগ রাখিয়া দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে-ভালোবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর এত গাঢ়তা, যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক, যাহার মুহূর্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়, যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না-- সেই ভালোবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর! সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালোবাসা চূর্ণ হইয়া একমুঠি ধুলি হইয়া গেল। হেমন্ত কম্পিতস্বরে এই কিছু পূর্বে কানের কাছে বলিতেছিল, “চমৎকার রাত্রি” সে রাত্রি তো এখনো শেষ হয় নাই ; এখনো সেই পাপিয়া ডাকিতেছে, দক্ষিণের বাতাস মশারি কাঁপাইয়া যাইতেছে, এবং জ্যোৎস্না সুখশান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মতো বাতায়নবর্তী পালঙ্কের একপ্রান্ত নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্তই মিথ্যা। ভালোবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতেই অনিদ্রাশুষ্ক হেমন্ত পাগলের মতো হইয়া প্যারিশংকর ঘোষালের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। প্যারিশংকর জিজ্ঞাসা করিল, “কী হে বাপু, কী খবর?”

হেমন্ত মস্ত একটা আঙনের মতো যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, “তুমি আমাদের জাতি নষ্ট করিয়াছ, সর্বনাশ করিয়াছ-- তোমাকে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে”-- বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্যারিশংকর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “আর তোমরা আমার জাতি রক্ষা করিয়াছ, আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছ! আমার প্রতি তোমাদের বড়ো যত্ন, বড়ো ভালোবাসা!”

হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্তেই প্যারিশংকরকে ব্রহ্মতেজে ভস্ম করিয়া দিতে, কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জ্বলিতে লাগিল, প্যারিশংকর দিব্য সুস্থ নিরাময় ভাবে বসিয়া রহিল।

হেমন্ত ভগ্নকণ্ঠে বলিল, “আমি তোমার কী করিয়াছিলাম!”

প্যারিশংকর কহিল, “আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটিমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কী অপরাধ করিয়াছিল। তুমি তখন ছোটো ছিলে, তুমি হয়তো জানো না-খেটনাটা তবে মন দিয়া শোনো। ব্যস্ত হইয়ো না বাপু, ইহার মধ্যে অনেক কৌতুক আছে।

“আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুরি করিয়া যখন পালাইয়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশু ছিলো। তাহার পর পাঁচ বৎসর বাদে সে যখন বারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে কিংবা তুমি না জানিতেও পার, তুমি তখন কলিকাতার স্কুলে পড়িতো তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন-- মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠানো অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, দাদা, এ যাত্রা তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছি, তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও। তোমার বাপ কিছুতেই রাজি হইলেন না, আমিও আমার একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জাত ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া ঘর করিলাম। এখানে আসিয়াও আপদ মিটিল না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি তোমার

বাপ কন্যাকর্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নহি-- এইবার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছ-- কিন্তু আর-একটু সবুর করো-- সমস্ত ঘটনাটি শুনিলে খুশি হইবে-- ইহার মধ্যে একটু রস আছে।

“তুমি যখন কালেজে পড়িতে তোমার বাসার পাশেই বিপ্রদাস চাটুজ্যের বাড়ি ছিল। বেচারী এখন মারা গিয়াছে। চাটুজ্যোমহাশয়ের বাড়িতে কুসুম নামে একটি শৈশববিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত। মেয়েটি বড়ো সুন্দরী-- বড়ো ব্রাহ্মণ কালেজের ছেলেরদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সংবরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বড়োমানুষকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছুই শক্ত নহে। মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শুকাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া মুখস্থ হইত না। পরস্পরের ছাত হইতে তোমাদের কোনোরূপ কথাবার্তা হইত কি না সে তোমরাই জানো, কিন্তু মেয়েটির ভাবগতিক দেখিয়া বুড়ার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ, কাজকর্মে তাহার ক্রমিক ভুল হইতে দেখা গেল এবং তপস্বিনী গৌরীর মতো দিন দিন সে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিতে লাগিল। এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে বুড়ার সম্মুখেই অকারণে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না।

“অবশেষে বুড়া আবিষ্কার করিল, ছাতে তোমাদের মধ্যে সময়ে অসময়ে নীরব দেখাসাক্ষাৎ চলিয়া থাকে-- এমন-কি, কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলের ঘরের ছায়ায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে ; নির্জন অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, খুড়ো, তুমি তো অনেক দিন হইতে কাশী যাইবার মানস করিয়াছ-- মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও, আমি তাহার ভার লইতেছি।

“বিপ্রদাস তীর্থে গেল। আমি মেয়েটিকে শ্রীপতি চাটুজ্যের বাসায় রাখিয়া তাহাকেই মেয়ের বাপ বলিয়া চালাইলাম। তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার কাছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিয়া বলিয়া বড়ো আনন্দ

লাভ করিলাম। এ যেন একটি গল্পের মতো। ইচ্ছা আছে, সমস্ত লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাইব। আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোটা শুনিতেছি একটু-আধটু লেখে-- তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সবচেয়ে ভালো হয়, কারণ, গল্পের উপসংহারটি আমার ভালো করিয়া জানা নাই”

হেমন্ত প্যারিশংকরের এই শেষ কথাগুলিতে বড়ো একটা কান না দিয়া কহিল, “কুসুম এই বিবাহে কোনো আপত্তি করে নাই?”

প্যারিশংকর কহিল, “আপত্তি ছিল কি না বোঝা ভারি শক্ত। জান তো বাপু, মেয়েমানুষের মন ; যখন ‘না’ বলে তখন ‘হাঁ’ বুঝিতে হয়। প্রথমে তো দিনকতক নূতন বাড়িতে আসিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মতো হইয়া গেল। তুমিও দেখিলাম কোথা হইতে সন্ধান পাইয়াছ ; প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাত্রা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত-- এবং শ্রীপতির বাসার সম্মুখে আসিয়া কী যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে-- ঠিক যে প্রেসিডেন্সি কলেজের রাস্তা খুঁজিতে তাহা বোধ হইত না, কারণ ভদ্রলোকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ ছিল মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া আমার বড়ো দুঃখ হইল। দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়োই ব্যঘাত হইতেছে এবং মেয়েটির অবস্থাও সংকটাপন্ন।

“একদিন কুসুমকে ডাকিয়া লইয়া কহিলাম, বাছা, আমি বুড়ামানুষ, আমার কাছে লজ্জা করিবার আবশ্যক নাই-- তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি ছেলেটিও মাটি হইবার জো হইয়াছে। আমার ইচ্ছা তোমাদের মিলন হয়। শুনিবামাত্র কুসুম একেবারে বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া পালাইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রায় মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় শ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তোমার কথা পাড়িয়া ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙিলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, বিবাহ ব্যতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া মিলনের আর কোন উপায় নাই। কুসুম কহিল, কেমন করিয়া হইবে। আমি কহিলাম, তোমাকে কুলীনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দিব। অনেক তর্কের পর সে এ-বিষয়ে তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম,

ছেলেটা একে খেপিয়া যাইবার জো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ-সকল গোলমালের কথা বলিবার আবশ্যক কী। কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিন্তে নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই সকল দিকে সুখের হইবে। বিশেষত এ কথা যখন কখনো প্রকাশ হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মতো অসুখী করা।

“কুসুম বুঝিল কি বুঝিল না, আমি বুঝিতে পারিলাম না। কখনো কাঁদে কখনো চুপ করিয়া থাকে। অবশেষে আমি যখন বলি ‘তবে কাজ নাই’ তখন আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীপতিকে দিয়া তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই। দেখিলাম সম্মতি দিতে তোমার তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল।

“বিবাহের অনতিপূর্বে কুসুম এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে, বলে, ইহাতে কাজ নাই, জ্যাঠামশায়। আমি বলিলাম, কী সর্বনাশ, সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এখন কী বলিয়া ফিরাইবা। কুসুম বলে, তুমি রঙ্কুরিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, আমাকে এখান হইতে কোথাও পাঠাইয়া দাও। আমি বলিলাম, তাহা হইলে ছেলেটির দশা কী হইবে। তাহার বহুদিনের আশা কাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে, আজ আমি হঠাৎ তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব! আবার তাহার পরদিন তোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই বুড়াবয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি।

“তাহার পর শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল-- আমি আমার একটা কর্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কী হইল তুমি জান।”

হেমন্ত কহিল, “আমাদের যাহা করিবার তাহা তো করিলেন, আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন।”

প্যারিশংকর কহিলেন, “দেখিলাম তোমার ছোটো ভগ্নীর বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম, একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি কিন্তু সে কেবল কর্তব্যবোধে। আবার আর-একটা ব্রাহ্মণের জাত মারা পড়ে,

আমার কর্তব্য এটা নিবারণ করা। তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমন্ত যে শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে”

হেমন্ত বহুকষ্টে ধৈর্য সংবরণ করিয়া কহিল, “এই যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কী হইবে। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন?”

প্যারিশংকর কহিলেন, “আমার যাহা কাজ তাহা আমি করিয়াছি, এখন পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম নহে-- ওরে, হেমন্তবাবুর জন্য বরফ দিয়া একগ্লাস ডাবের জল লইয়া আয় আর পান আনিসা”

হেমন্ত এই সুশীতল আতিথ্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখি ডাকিতেছে না। পুস্করিণীর ধারের লিচুগাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর কালির দাগের মতো লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে। আর আকাশের তারা নির্নিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কী একটা রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

শয়নগৃহে দীপ জ্বালা নাই। হেমন্ত বাতায়নের কাছে খাটের উপরে বসিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। কুসুম ভূমিতলে দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে। সময় যেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মতো স্থির হইয়া আছে। যেন অনন্ত নিশীথিনীর উপর অদৃষ্ট চিত্রকর এই একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে-- চারি দিকে প্রলয়, মাঝখানে একটি বিচারক এলং তাহার পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী।

আবার চটিজুতার শব্দ হইল। হরিহর মুখুজ্যে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন, “অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটিকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও”

কুসুম এই স্বর শুনিবামাত্র একবার মুহূর্তের মতো চিরজীবনের সাথ
মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল-- চরণ চুম্বন করিয়া
পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া পা ছাড়াইয়া দিল।

হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল, “আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।”

হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, “জাত খোয়াইবি ?”

হেমন্ত কহিল, “আমি জাত মানি না।”

“তবে তুইসুদ্ধ দূর হইয়া যা।”

বৈশাখ, ১২৯৯

একরাত্রি

সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, বউ-বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড় যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, “আহা দুটিতে বেশ মানায়া”

ছোট ছিলাম কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম বুঝতে পারিতাম। সুরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবি ছিল, সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকলরকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল না-- আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল, আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারি-সেরেক্তার কাজ শিখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যুচ্চ ছিল-- কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব, ইহা আমি মনে মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। সর্বদাই দেখিতাম, আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন--নানা উপলক্ষে মাছটা তরকারিটা টাকটা সিকেটা লইয়া যে তাহাদের পূজার্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল, এইজন্য আদালতে ছোটো কর্মচারী এমন-কি, পেয়াদাগুলোকে পর্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্মানের আসন দিয়াছিলাম। ইহারা আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা।

তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ। বৈযয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশী-- সুতরাং পূর্বে গণেশের যাহা কিছু পাওনা ছিল, আজকাল ইহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া একসময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতায় পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপি লোকের বাসায় ছিলাম, তাহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া যথা নিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভাসমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণ বিসর্জন করা যে আশু আবশ্যিক, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কী করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না।

কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো ত্রুটি ছিল না। আমরা পাড়াগাঁয়ে ছেলে, কলিকাতার হাঁচড়ে-পাকা ছেলের মতো সকল জিনিসকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই, সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না-খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টো টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেষ্ট্রি টোকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। শহরের ছেলেরা এইসব লক্ষণ দেখিয়া আমাদেরকে বাঙাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাটসীনি গারিবাণ্ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন।

আমি পনেরো বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় পালাইয়া আসি, তখন সুরবালার বয়স আট ; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে আমার বিবাহের বয়স

ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এদিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব-- বাপকে বলিলাম, বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।

দুই-চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম, উকিল রামলোচনবাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

এন্ট্রেন্স পাস করিয়াছি, ফাস্ট আর্টস দিব, এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই, মাতা এবং দুটি ভগিনী আছেন। সুতরাং কালেজ ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে ফিরিতে হইল। বহু চেষ্টায় নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোটো শহরে এন্ট্রেন্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগ্জামিনের তাড়া চের বেশি। ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যালাঙ্জের বহির্ভূত কোনো কথা বলিলে হেডমাস্টার রাগ করে। মাস-দুয়েকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইয় আসিল।

আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় একপেট জাবনা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে ; লক্ষ্মে-ঝল্মে আর উৎসাহ থাকে না।

অগ্নিদাহের আশঙ্কায় একজন করিয়া মাস্টার স্কুলের ঘরেতেই বাস করিত। আমি একা মানুষ, আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বড়ো আটচালার সংলগ্ন একটি চালায় আমি বাস করিতাম।

স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে। একটি বড়ো পুস্করিণীর ধারে। চারিদিকে সুপারি নারিকেল এবং মাদারের গাছ, এবং স্কুলগৃহের প্রায় গায়েই দুটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিমগাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।

একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই এবং এতদিন উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুলঘরের অনতিদূরে। এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী-- আমার বাল্যসখী সুরবালা-- ছিল, তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। সুরবালার সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল, তাহা রামলোচনবাবু জানিতেন কি না জানি না, আমিও নূতন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করিলাম না। এবং সুরবালা যে কোনোকাল আমার জীবনের সঙ্গে কোনোরূপ জড়িত ছিল, সে কথা আমার ভালো করিয়া মনে উদয় হইল না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচনবাবুর বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। মনে নাই কী বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, বোধ করি বর্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে সেজন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ত্রিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টা এমন যে তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘন্টাকানেকদেড়েক অনর্গল শখের দুঃখ করা যাইতে পারে।

এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খসখস্ এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম ; বেশ বুঝিতে পারিলাম জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল-- বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশবপ্রীতিতে ঢলাঢলা দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরঅস্থির দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি যাহা করি কিছুতেই মনের ভার দূর হয় না ; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতো হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন। মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল।

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্য বসিয়া থাকিবে।

মনের ভিতরে কে বলিল, তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না। সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

আমি বলিলাম, তা থাক্-না, সুরবালা আমার কে।

উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।

সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত-- সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ। আর, একটা রামলোচন কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত ; কেবল গোটা-দুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরাবালাকে পৃথিবীর আর-সকলের নিকট হইতে একমুহূর্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই ; বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত। রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে-সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসংগত এবং অন্যায্য তাহা স্বীকার করি কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোনো কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপুরবেলায় ক্লাসে যখন ছাত্রেরা গুন্ গুন্ করিতে থাকিতে, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিমগাছের পুষ্পমঞ্জরির সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত-- কী ইচ্ছা করিত জানি না-- এই পর্যন্ত বলিতে পারি, ভারতবর্ষের এই সমস্ত ভাবী আশাষ্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

স্কুলের ছুটি হইয়া গেলে আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে মন টিকিত না, অথচ কোনো ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেও অসহ্য বোধ হইত। সন্ধ্যাবেলায় পুষ্করিণীর ধারে সুপারি-নারিকেলের অর্থহীন মর্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতাম, মনুষ্যসমাজ একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারো মনে পড়ে না, তাহার পরে বৈঠক সময়ে বৈঠক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।

তোমার মতো লোক সুরবালার স্বামীটি হইয়া বুড়াবয়স পর্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিত, তুমি কিনা হইতে গেলে গারিবাল্ডি এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগোঁয়ে স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। আর রামলোচন রায় উকিল, তাহার বিশেষ করিয়া সুরাবালারই স্বামী হইবার কোনো জরুরি আবশ্যক ছিল না ; বিবাহের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার পক্ষে সুরবালাও যেমন ভবশংকরীও তেমন, সেই কিনা কিছুমাত্র না ভাবিয়াচিন্তিয়া বিবাহ করিয়া সরকারি উকিল হইয়া দিব্য পাঁচটাকা রোজগার করিতেছে-- যেদিনে দুখে ধোঁয়ার গন্ধ হয় সেদিন সুরাবালাকে তিরস্কার করে, যেদিন মন প্রসন্ন থাকে সেদিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটাসোটা, চাপকান-পরা, কোনো অসন্তোষ নাই, পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোনোদিন হাছতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।

রামলোচন একটা বড়ো মকদ্দমায় কিছুকালের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। আমার স্কুলঘরে আমি যেমন একলা ছিলাম সেদিন সুরবালার ঘরেও সুরবালা বোধ করি সেইরূপ একা ছিল।

মনে আছে সেদিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে বেলা দশটা হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেড্‌মাস্টার সকাল সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন বিকেলের দিকে মুঘলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড় আরম্ভ হইল। যত রাত্রি হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং বাড়ের বেগ বাড়িতে চলিল। প্রথমে পূর্ব দিক হইতে বাতাস বহিতেছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তরপূর্ব দিয়া বহিতে লাগিল।

এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা করা বৃথা। মনে পড়িল, এই দুর্বোঁগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবুত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি পুস্করিণীর পাড়ের উপর রাত্রিযাপন করিবা। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা-দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল-- সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। সুরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদের পুস্করিণীর পাড়-- সে পর্যন্ত যাইতে নাযোইতে আমার হাঁটুজল হইল। পাড়ের উপর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতীয় আর-একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের পুকুরের পাড়ের একটা অংশ প্রায় দশ-এগারো হাত উচ্চ হইবে।

পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠিলাম, বিপরীত দিক হইতে আর-একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাআ, আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত বুঝিতে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর-সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল-হাত-পাঁচছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে-- তখন একটা কথা বলিলেও

ক্ষতি ছিল না-- কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।

কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা, কোন্-এক জন্মান্তর, কোন্-এক পুরাতন রহস্যাক্ষকার হইতে ভাসিয়া, এই সূর্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল ; আর, আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ংকর জনশূন্য প্রলয়াক্ষকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে-- এখন কেবল আর-একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে বিচ্ছেদের এই বৃত্তটুকু হইতে, খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আসুক। স্বামীপুত্রগৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আশ্বাদ পাইয়াছি।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল-- ঝড় থামিয়া গেল, জল নামিয়া গেল-- সুরবালা কোনো কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোনো কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল-- আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

একটা আষাড়ে গল্প

১

দূর সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেকা এবং গোলামের বাসা। দুরি তিরি হইতে নহলা-দহলা পর্যন্ত আরো অনেক-ঘর গৃহস্থ আছে কিন্তু তাহারা উচ্চজাতীয় নহে।

টেকা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা-দহলারা অন্ত্যজ-- তাহাদের সহিত এক পঙ্ক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য মর্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্তত হইবার জো নাই। সকলেই যথানির্দিষ্টমতে আপন আপন কাজ করিয়া যায়। বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ববর্তীদিগের উপর দাগা বুলাইয়া চলা।

সে যে কী কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলাফেরা, নিয়মে যাওয়া-আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যালফ্যাল ছবির মতো। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না ; সকলেই মৌন নির্জীবভাবে নিঃশব্দ পদচারণা করিয়া বেড়ায় ; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারো কোনো আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন

পাখি ঝটপট করে, এই চিত্রিতবৎ মূর্তিগুলির অন্তরে সেরূপ কোনো-একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এককালে এই খাঁচাগুলির মধ্যে জীবের বসতি ছিল-- তখন খাঁচা দুলিত এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শোনা যাইত। গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত-- এখন কেবল পিঞ্জরের সংকীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল শ্রেণী-বিন্যস্ত লৌহশলাকাগুলাই অনুভব করা যায়-- পাখি উড়িয়াছে কি মরিয়াছে কি জীবন্ত হইয়া আছে, তাহা কে বলিতে পারে।

আশ্চর্য স্তব্ধতা এবং শান্তি। পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলই সুসংহত, সুবিহিত-- শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই-- কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সমুদ্র অবিশ্রাম একতানশব্দপূর্বক তটের উপর সহস্র ফেনশুভ্র কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমস্ত দীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে-- পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীলপক্ষের মতো আকাশ দিগ্দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতিদূর পরপারে গাঢ় নীল রেখার মতো বিদেশের আভাস দেখা যায়-- সেখান হইতে রাগ-দ্বেষের দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

২

সেই পরপারে, সেই বিদেশে এক দুয়ারানীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে। সে তাহার নির্বাসিত মাতার সহিত সমুদ্রতীরে আপনমনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিলাষের জাল বুনিতেছে। সেই জাল দিগ্দিগন্তেরে নিষ্ক্ষেপ করিয়া কল্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার দ্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে আকাশের সীমায় ঐ দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে-- খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ

ঘোড়া, সাপের মাথায় মানিক, পারিজাত পুষ্প, সোনার কাঠি, রুপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপুত্র পাঠশালা পড়িতে যায়, সেখানে পাঠান্তে সদাগরের পুত্রের কাছে দেশ-বিদেশের কথা এবং কোটালের পুত্রের কাছে তাল-বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে-- গৃহদ্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে, মা, একটা খুব দূর দেশের গল্প বলো। মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্যশ্রুত এক অপূর্ব দেশের অপূর্ব গল্প বলিতেন-- বৃষ্টির বর্ষবর্ষ শব্দের মধ্যে সেই গল্প শুনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

একদিন সদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল, সাঙাত, পড়াশুনা তো সাজ্জ করিয়াছি, এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব তাই বিদায় লইতে আসিলাম।

রাজার পুত্র কহিল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কোটালের পুত্র কহিল, আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে ; আমিও তোমাদের সঙ্গী।

রাজপুত্র দুঃখিনী মাকে গিয়া বলিল, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইতেছি-- এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সমুদ্রে সদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল-- তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল--নৌকাগুলো রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খদ্বীপে গিয়া একনৌকা শঙ্খ, চন্দনদ্বীপে গিয়া একনৌকা চন্দন, প্রবালদ্বীপে গিয়া একনৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসরে গজদন্ত মৃগনাভি লবঙ্গ জায়ফলে যখন আর চারটি নৌকা পূর্ণ হইল, তখন সহসা একটা বিপর্যয় ঝড় আসিল।

সব-কটা নৌকা ডুবিল, কেবল একটা নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

এই দ্বীপে তাসের টেক্কা, তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথানিয়মে বাস করে এবং দহলা-নহলাগুলাও তাহাদের পদানুবর্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।

৪

তাসের রাজ্যে এতদিন কোনো উপদ্রব ছিল না। এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পরে প্রথম এই একটা তর্ক উঠিল-- এই যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল, ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে।

প্রথমত, ইহারা কোন্ জাতি-- টেক্কা, সাহেব, গোলাম না দহলা-নহলা ?

দ্বিতীয়ত, ইহারা কোন্ গোত্র-- ইস্কাবন, চিড়েতন, হরতন অথবা রুহিতন ?

এ-সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোনোরূপ ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অন্ত খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে, ইহাদের মধ্যে অধিকারভেদে কেই বা বায়ুকোণে, কেই বা নৈঋতকোণে, কেই বা ঈশানকোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এতবড়ো বিষম দুশ্চিন্তার কারণ ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটে নাই।

কিন্তু ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির এ-সকল গুরুতর বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা নাই। তাহারা কোনো গতিকে আহার পাইলে বাঁচো। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে ইতস্তত করিতে লাগিল এবং বিধান খুঁজিবার জন্য টেক্কারা বিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যে যেখানে যে-খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে দুরি তিরি পর্যন্ত অবাক। তিরি কহিল, ভাই দুরি, ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই। দুরি কহিল, ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি, ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচজাতীয়।

আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া তিন বন্ধু দেখিল, এখানকার মানুষগুলা কিছু নূতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা একপ্রকার হতবুদ্ধিভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দুলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা-কিছু করিতেছে তাহা যেন আর-একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুংলাবজির দৌদুল্যমান পুতুলগুলি মতো। তাই কাহারো মুখে ভাব নাই, ভাবনা নাই, সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবসুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।

চারি দিকে এই জীবন্ত নির্জীবতার পরম গম্ভীর রকমসকম দেখিয়া রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই আন্তরিক কৌতুকের উচ্চ হাস্যধ্বনি তাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলই এমনি একান্ত যথাযথ, এমনি পরিপাটি, এমনি প্রাচীন, এমনি সুগম্ভীর যে কৌতুক আপনার অকস্মাৎ-উচ্ছ্বসিত, উচ্ছৃঙ্খল শব্দে আপনি চকিত হইয়া স্তলান হইয়া নির্বাপিত হইয়া গেল-- চারিদিকের লোকপ্রবাহ পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ গম্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্রকে কহিল, ভাই সাঙাত, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর একদণ্ড নয়। এখানে আর দুই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।

রাজপুত্র কহিল, না ভাই, আমার কৌতূহল হইতেছে ইহারা মানুষের মতো দেখিতে-- ইহাদের মধ্যে এক ফোঁটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।

৫

এমনি তো কিছুকাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোনো নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। যেখানে যখন ওঠা, বসা, মুখ ফেরানো, উপুড় হওয়া, চিৎ হওয়া, মাথা নাড়া, ডিগবাজি খাওয়া উচিত, ইহারা তাহার কিছুই করে না বরং সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে এবং হাসে। এই সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাষ্টীর্ষ আছে, ইহারা তদ্বারা অভিভূত হয় না।

একদিক টেক্সা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত্র কোটালের পুত্র এবং সদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মতো গলা করিয়া অবিচলিত গাষ্টীরমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন।

তিন বন্ধু উত্তর করিল, আমাদের ইচ্ছা।

হাঁড়ির মতো গলা করিয়া তাসরাজ্যের তিন অধিনায়ক স্বপ্নাভিভূতের মতো বলিল, ইচ্ছা ? সে বেটা কে।

ইচ্ছা কী সেদিন বুঝিল না কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিল। প্রতিদিন দেখিতে লাগিল এমন করিয়া না চলিয়া অমন করিয়া চলাও সম্ভব, যেমন এদিক আছে তেমনি ওদিকও আছে-- বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এমনি করিয়া তাহার ইচ্ছানামক একটা রাজশক্তির প্রভাব অস্পষ্টভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ঐ সেটি যেমনি অনুভব করা অমনি তাসরাজ্যের আগাগোড়া অল্প অল্প করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল-- গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগরসর্পের অনেকগুলো কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন অত্যন্ত মন্দাগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইরূপ।

নির্বিকারমূর্তি বিবি এতদিন কাহারো দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, নির্বাক নিরুদ্বেগভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসন্তের অপরাহ্নে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মতো ঘনকৃষ্ণ পশ্চিম উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রের কটাক্ষপাত করিল। রাজপুত্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল, এ কী সর্বনাশ! আমি জানিতাম, ইহারা এক-একটা মূর্তিবৎ-- তাহা তো নহে, দেখিতেছি এ যে নারী। কোটালের পুত্র ও সদাগরের পুত্রকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল, ভাই, ইহার মধ্যে বড়ো মাধুর্য আছে। তাহার সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল যেন আমি এক নূতনসৃষ্ট জগতের প্রথম উষার প্রথম উদয় দেখিতে পাইলাম। এতদিন যে ধৈর্য ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সার্থক হইল।

দুই বন্ধু পরম কৌতূহলের সহিত সহাস্যে কহিল, সত্য নাকি সাঙাত।

সেই হতভাগিনী হরতনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মুহূর্ত্ত তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল। মনে করো, যখন তাহাকে গোলামের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে তখন সে হঠাৎ রাজপুত্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়-গোলাম অবিচলিত ভাবে সুগভীর কণ্ঠে বলে, বিবি, তোমার ভুল হইল। শুনিয়া হরতনের বিবির স্বভাবতরঙ্গকপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নির্নিমেষ প্রশান্ত দৃষ্টি নত হইয়া যায়। রাজপুত্র উত্তর দেয়, কিছু ভুল নাই, আজ হইতে আমিই গোলাম।

নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কী অভূতপূর্ব শোভা, এ কী অভাবনীয় লাভণ্য বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। তাহার গতিতে এ কী সুমধুর চাঞ্চল্য, তাহার দৃষ্টিপাতে এ কী হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কী একটি সুগন্ধি আরতি-উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই নব অপরাধিনীর ভ্রমসংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সকলেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেকা আপনার চিরন্তন মর্যাদারক্ষার

কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা-নহলাগুলো পর্যন্ত কেমন হইয়া গেল।

এই পুরাতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আরকেখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা একসুরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে-- আজ সহসা দক্ষিণবায়ুচঞ্চল বিশ্বব্যাপী দুরন্ত যৌবন-তরঙ্গরাশির মতো আলোতে ছায়াতে ভঙ্গীতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম। কোথায় গেল সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখচ্ছবি। কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারো বা রাত্রে নিদ্রা হয় না, কাহারো বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারো ঈর্ষা, কাহারো অনুরাগ, কাহারো ব্যাকুলতা, কাহারো সংশয় কোথাও হাসি, কোথাও রোদন, কোথাও সংগীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাত মন্দ না হউক কিন্তু উহার শ্রী নাই-- আমার চালচলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে, কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

সাহেব ভাবিতেছে, টেক্কা সর্বদা ভারি টকটক্ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে, মনে করিতেছে, উহাকে দেখিয়া বিবিগুলো বুক ফাটিয়া মারা গেল-- বলিয়া ঈষৎ বক্র হাসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগুলি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসজ্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আ মরিয়া যাই। গর্বিণীর এত সাজের ধুম

কিসের জন্য গো বাপু। উহার রকমসকম দেখিয়া লজ্জা করে! বলিয়া দ্বিগুণ প্রযত্নে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সখায় কোথাও দুই সখীতে গলা ধরিয়া নিভূতে বসিয়া গোপন কথাবার্তা হইতে থাকে। কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো রাগ করে, কখনো মান-অভিমান চলে, কখনো সাধাসাধি হয়।

যুবকগুলা পথের ধারে বনের ছায়ায় তরুন্মূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া শুষ্কপত্রাশির উপর পা ছড়াইয়া অলসভাবে বসিয়া থাকে। বালা সুনীল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপনমনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়, যেন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোনো কোনো খেপা যুবক দুঃসাহসে ভর করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মতো একটাও কথা জোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অনুকূল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মুহূর্তের মতো ক্রমে ক্রমে দূরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাখি ডাকিতে থাকে, বাতাস অঞ্চল ও অলক উড়াইয়া হুহু করিয়া বহিয়া যায়, তরুপল্লব ঝর্ঝর্ মর্ম্ম করে এবং সমুদ্রের অবিশ্রাম উচ্ছ্বসিত ধ্বনি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দ্বিগুণ দোদুল্যমান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

৮

রাজপুত্র দেখিলেন, জোয়ারভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্‌থম করিতেছে-- কথা নাই, কেবল মুখচোওয়াচাওয়া ; কেবল এক পা এগোনো, দুই পা পিছনো ; কেবল আপনার মনের বাসনা জুপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে আছতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাক্যহীন হইয়া যাইতেছে।

কেবল চোখ-দুটা জ্বলিতেছে, এবং অন্তর্নিহিত বাণীর আন্দোলনে ওষ্ঠাধর বায়ুকম্পিত পল্লবের মতো স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, বাঁশি আনো, তুরীভেরী বাজাও, সকলে আনন্দধ্বনি করো, হরতনের বিবি স্বয়ম্বর হইবেন।

তৎক্ষণাৎ দহলা-নহলা বাঁশিতে ফুঁ দিতে লাগিল, দুরি তিরি তুরীভেরী লইয়া পড়িল। হঠাৎ এই তুমুল আনন্দতরঙ্গে সেই কানাকানি চাওয়াচাওয়ি ভাঙিয়া গেল।

উৎসবে নরনারী একত্র মিলিত হইয়া কত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস। কত রহস্যচ্ছলে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চহাস্যে তুচ্ছ আলাপ। ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় লতায় বৃক্ষে নানা ভঙ্গিতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে, ইহাদের মধ্যে তেমনি হইতে লাগিল।

এমনি কলরব আনন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড়ো মধুর স্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিল। যাহারা ভালো করিয়া ভালোবাসে নাই তাহারা ভালোবাসিল, যাহারা ভালোবাসিয়াছিল তাহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হরতনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমস্তদিন একটা গোপন ছায়াকুঞ্জে বসিয়া ছিল। তাহার কানেও দূর হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দুটি চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছিল ; হঠাৎ এক সময়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে রাজপুত্র বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে ; সে অমনি কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুপ্তিত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমস্তদিন একাকী সমুদ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সম্ভ্রান্ত নৈরঞ্জেপ এবং সলজ্জ লুপ্তন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

রাত্রে শতসহস্র দীপের আলোকে, মালার সুগন্ধে, বাঁশির সংগীতে, অলংকৃত সুসজ্জিত সহস্র্য শ্রেণীবদ্ধ যুবকদের সভায় একটি বালিকা ধীরে ধীরে কম্পিত চরণে মালা হাতে করিয়া রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল। অভিলষিত কণ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না। রাজপুত্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মাল্য স্খলিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠে পড়িয়া গেল। চিত্রবৎ নিস্তব্ধ সভা সহসা আনন্দোচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপুত্রকে সকলে মিলিয়া রাজ্যে অভিষেক করিল।

সমুদ্রপারের দুঃখিনী দুয়ারানী সোনার তরীতে চড়িয়া পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর পূর্বের মতো সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্তনীয় গাভীর্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখদুঃখ রাগদ্বৈষ বিপদসম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নবরাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন কেহ ভালো, কেহ মন্দ, কাহারো আনন্দ, কাহারো বিষাদ-- এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলঙ্ঘ্য বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু এবং অসাধু।

আষাঢ়, ১২৯৯

জীবিত ও মৃত

প্রথম পরিচ্ছেদ

রানীহাটের জমিদার শারদাশংকরবাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির পিতৃকুলে কেহ ছিল না ; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই পুত্রও নাই। একটি ভাঙ্গুরপো, শারদাশংকরের ছোটো ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল, সেইজন্য এই বিধবা কাকি কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছে। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশি হয়, কারণ তাহার উপরে অধিকার থাকে না ; তাহার উপরে কোনো সামাজিক দাবি নাই, কেবল স্নেহের দাবি-- কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবি কোনো দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালোবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছেলেটির প্রতি সিঞ্জন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কী কারণে তাহার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল-- সময় জগতের আর-সর্বত্রই চলিতে লাগিল, কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মতো বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পুলিশের উপদ্রব ঘটে এইজন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন ব্রাহ্মণ কর্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রানীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহুদূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটির এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর কোথাও কিছু নাই। পূর্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে। সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্মিত

হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই পুস্করিণীকে পূর্ণ স্রোতস্থিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ গণ্য করে।

মৃতদেহ কুটিরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে অধীর হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থম্‌থমে মেঘ করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না ; অন্ধকার ঘরে দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহু চেষ্টাতেও জ্বলিল না-- যে-লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল, “ভাই রে, এক ছিলিম তামাকের জোগাড় থাকিলে বড়ো সুবিধা হইত। তাড়াতাড়ি কিছুই আনা হয় নাই”

অন্য ব্যক্তি কহিল, “আমি চট্ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সঞ্চার করিয়া আনিতে পারি”

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল, “মাইরি! আর, আমি বুঝি এখানে একলা বসিয়া থাকিবা”

আবার কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘন্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকে মনে মনে ইহার গালি দিতে লাগিল-- তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই-- কেবল পুস্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতেছে। এমন সময়ে মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল-- যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্তে ঘর হইতে লক্ষ্য দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ-দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহাদের অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোনো খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে-- অনতিবিলম্বে রওনা হইবো। তখন বিধু এবং বনমালী কুটিরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শ্মশানে সেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে।

পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল। যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু আচ্ছাদন-বস্ত্রটি পর্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে কুটিরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়া ছিল, তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশংকর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোনো শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে দাহকার্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভালো।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল, তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্বেই কার্য শেষ করা হইয়াছে, কুটিরের মধ্যে কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারো সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না-- কারণ, মৃতদেহ এমন-কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকলেই জানেন, জীবনের যখন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এবং সময়মতো পুনর্ব্যবস্থা মতবৎ দেহে তাহার কার্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই-- হঠাৎ কী কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল, চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাত্যাসমতো যেখানে শয়ন করিয়া থাকে, মনে হইল, এটা সে জায়গা নহে। একবার ডাকিল ‘দিদি’-- অন্ধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বন্ধের কাছে একটি বেদনা-- শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড়ো জা ঘরের কোণে বসিয়া একটি অগ্নিকুণ্ডের উপরে খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছে-- কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল-- রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও-- আমার প্রাণ কেমন করিতেছে” তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল-- যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াতশুদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িল-- কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশৃঙ্খলের সমস্ত অক্ষর একমুহূর্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মতো তাহার সেই সুমিষ্ট ভালোবাসার স্বরে কাকিমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহপাথ্যটুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কি না বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল, যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মুক্তদ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদলার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কানে প্রবেশ করিল, তখন এক মুহূর্তে তাহার এই স্বপ্ন জীবনের আশৈব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকটসংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া

উঠিল ; সম্মুখে পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং সুদূর তরুশ্রেণী এক পলকে চোখে পড়িল। মনে পড়িল, মাঝে মাঝে পুণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কী ভয়ানক মনে হইত।

প্রথমে মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনই ভাবিল, আমি তো বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে লইবে কেন। সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্বাসিত হইয়া আসিয়াছি-- আমি যে আমার প্রেতাআ।

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্ধরাত্রে শারদাশংকরের সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে এই দুর্গম শ্মশানে আসিল কেমন করিয়া। এখনো যদি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কেথায় ? শারদাশংকরের আলোকিত গৃহে তাহার মৃত্যুর শেষে মুহূর্ত মনে পড়িল, তাহার পরেই এই বহুদূরবর্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল, আমি এই পৃথিবীর জনসমাজের আর কেহ নহি-- আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণকারিণী ; আমি আমার প্রেতাআ।

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দিক হইতে বিশুনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অঙ্কুরিত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা-- যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এই অভূতপূর্ব নূতন ভাবের আবির্ভাবে উন্মত্তের মতো হইয়া হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল-- মনে লজ্জা ভয় ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না-- মাঝে মাঝে ধান্যক্ষেত্র-- কোথাও বা একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিয়াছে তখন অদূরে লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটো-একটা পাখির ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছু জানে না।

যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ংকর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যুদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রিজাগরণে পাগলের মতো হইয়া, কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পালাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়।

সে আসিয়া কহিল, “মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধু বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ।”

কাদম্বিনী প্রথমে কোনো উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধুর মতো দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ-সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল, “চলো মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই-- তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বলো।”

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শৃশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি তো নাই-- তখন ছেলেবেলার সহিকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলো এক-একসময় রীতিমত ভালোবাসার লড়াই চলিতে থাকে-- কাদম্বিনী জানাইতে চাহে ভালোবাসা তাহার দিকেই প্রবল, যোগমায়া জানাইতে চাহে কাদম্বিনী তাহার ভালোবাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোনো

সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে একদণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে কোনো পক্ষেরই কোনো সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল, “নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি যাইবা”

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন ; নিশিন্দাপুর যদিও নিকটবর্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণবাবুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিল, “ওমা, আমার কী ভাগ্য। তোমার যে দর্শন পাইব এমন তো আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভাই, তুমি কী করিয়া আসিলো। তোমার শৃশুরবাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!”

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল, অবশেষে কহিল, “ভাই, শৃশুরবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না। আমাকে দাসীর মতো বাড়ির একপ্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব।”

যোগমায়া কহিল, “ওমা, সে কী কথা। দাসীর মতো থাকিবে কেন। তুমি আমার সই, তুমি আমার”--ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল-- মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনোরূপ সংকোচ বা সন্ত্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে, এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না-- মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে

পরের সঙ্গে মেলা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়া'র মুখের দিকে চায় এবং কী যেন ভাবে-- মনে করে, স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়া ও যেন বহুদূরে আর-এক জগতে আছে। স্নেহ-মমতা এবং সমস্ত কৰ্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।

যোগমায়া'রও কেমন কেমন লাগিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না-- কারণ অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এইজন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে-- যদি দুইয়ের কোনোটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্বোধ হইয়া উঠিল, যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল, ভাবিল, এ কী উপদ্রব স্বক্ষের উপর চাপিল।

আবার আর-এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পলাইতে পারে না। যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্ধিককে ভয় করে-- যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়া। কিন্তু, কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সৰ্বাপেক্ষা বেশি ভয়-- বাহিরে তার ভয় নাই।

এইজন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক-একদিন চীৎকার করিয়া উঠিত-- এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা হুম্‌হুম্‌ করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গেল। চাকরদাসীরা এবং যোগমায়াও যখন-তখন যেখানে-সেখানে ভূত দেখিতে আরম্ভ করিল। একদিন এমন হইল, কাদম্বিনী অর্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়া'র গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল, “দিদি, দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো! আমায় একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।”

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তদগ্বেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল, “হাঁ গা, তুমি কেমনধারা লোক! একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুরঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল, মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তিমাত্র শুনি না! তোমার মনের ভাবটা কী বুঝাইয়া বলো দেখি। তোমরা পুরুষমানুষ এমনি জাতই বটে।”

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতিরঞ্চপরে পুরুষমানুষের একটা নির্বিচার পক্ষপাত আছে এবং সেজন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায়া অথচ সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্রস্পর্শপূর্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত।

তিনি মনে করিতেন, ‘নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত, তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই, তখন আমি ইহাকে কী করিয়া ত্যাগ করি’ এই বলিয়া তিনি কোনোরূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্ৰীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কৰ্তব্যবুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যিক, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভালো ফল নাও হইতে পারে, অতএব রানীহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কৰ্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি তো গেলেন, এদিকে যোগমায়া আসিয়া কাদম্বিনীকে কহিল, “সই, এখানে তোমার আর থাকা ভালো দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কী।”

কাদম্বিনী গম্ভীরভাবে যোগমায়া'র মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, “লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী”

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল, “তোমার না থাকে, আমাদের তো আছে। আমরা পরের ঘরের বধূকে কী বলিয়া আটক করিয়া রাখিবা”

কাদম্বিনী কহিল, “আমার শৃশুরঘর কোথায়”

যোগমায়া ভাবিল, আ-মরণ! পোড়াকপালী বলে কী।

কাদম্বিনী ধরে ধীরে কহিল, “আমি কি তোমাদের কেহ। আমি কি এ পৃথিবীর। তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালোবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি তো কেবল চাহিয়া আছি। তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া। বুঝিতে পারি না, ভগবান আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন। তোমরাও ভয় কর পাছে তোমাদের হাসিখেলার মধ্যে আমি অমঙ্গল আনি-- আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তোমাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। কিন্তু ঈশ্বর যখন আমাদের জন্য আর-কোনো স্থান গড়িয়া রাখেন নাই, তখন কাজে-কাজেই বন্ধন ছিঁড়িয়া যায় তবু তোমাদের কাছেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই”

এমনি ভাবে চাহিয়া কথাগুলো বলিয়া গেল যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কী বুঝিতে পারিল কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রানীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুখলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার বর্ষ বর্ষ শব্দে মনে হইতেছে, বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হইল।”

শ্রীপতি কহিলেন, “ সে অনেক কথা। পরে হইবে” বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী শুনিলে, বলো।”

শ্রীপতি কহিলেন, “নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।”

শুনবামাত্র যোগমায়া মনে মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনোই করে না, যদি বা করে কোনো সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিষ্টিং উষ্ণভাবে কহিলেন, “কিরকম শুনিলে?”

শ্রীপতি কহিলেন, “যে-স্ট্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সই কাদম্বিনী নহে।”

এমনতরো কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে-- বিশেষত নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে তো কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন, “আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে-- কী কথার শ্রী।”

শ্রীপতি বুঝাইলেন এস্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনোরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন, “ঐ শোনো! তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ। কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কী শুনিলে কী শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই। তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।”

নিজের কর্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বিস্তারিতভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন-- কিন্তু কোনো ফল হইল না। উভয়পক্ষে হাঁ-না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদম্বিনীকে এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারো মতভেদ ছিল না, কারণ শ্রীপতির বিশ্বাস, তাহার অতিথি

ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী-- তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে।

একজন বলেন, “ভালো বিপদেই পড়া গেল। আমি নিজের কানে শুনিয়া আসিলাম।”

আর-একজন দৃঢ়স্বরে বলেন, “সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি।”

অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, কাদম্বিনী কবে মরিল বলো দেখি।”

ভাবিলেন কাদম্বিনীর কোনো-একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাঁহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্বের দিনেই পড়ে। শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া একমুহূর্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদম্বিনী কহিল, “সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই আমি মরিয়া আছি।”

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন-- শ্রীপতির বাকস্মৃতি হইল না।

“কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই পরলোকেও স্থান নাই-- ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব” তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষা নিশীথে সুপ্ত বিধাতাকে জগ্ৰত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল-- “ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব”

এই বলিয়া মূর্ছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশৃঙ্খলিত কাদম্বিনী আপনার স্থান খুঁজিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া রানীহাটে ফিরিয়া গেল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্ঘোণের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন গৃহ আশ্রয় করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শৃশুরবাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু মস্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনোরূপ বাধা দিল না-- এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিণী শারদাশংকরের স্ত্রী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতেছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কী ভাবিয়া শৃশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে, কী হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল রক্তাশীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন ত্যাগের হইয়া উঠিল-- তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে চাপিয়া না ধরিলে কি বাঁচা যায়। আর, তাহার পর মনে

পড়িল, ‘আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে ইহার মা সঙ্গ ভালোবাসে, গল্প ভালোবাসে, খেলা ভালোবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিত ছিল, কখনো তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোনো দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবো’

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্ধ নিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল, “কাকিমা, জল দে” আ মরিয়া যাই! সোনা আমার, তোর কাকিমাকে এখনো ভুলিস নাই! তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদম্বিনী তাহাকে জলপান করাইল।

যতক্ষণ ঘুমের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কাকিমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্যবোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল এবং কাকিমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাকিমা, তুই মরে গিয়েছিলি?”

কাকিমা কহিল, “হাঁ খোকা”

“আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে যাবি নে?”

ইহার উত্তর দিবার পূর্বেই একটা গোল বাধিল-- ঝি একবাটি সাপু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া ‘মাগো’ বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মতো হইয়া গেলেন, পলাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।

এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল-- সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, “কাকিমা, তুই যা”

কাদম্বিনী অনেকদিন পরে আজ অনুভব করিয়াছে যে সে মরে নাই-- সেই পুরাতন ঘরদ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্তভাবেই আছে, মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ কোনো ব্যবধান জন্মায় নাই। সইয়ের

বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সেই মরিয়া গিয়াছে-- খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকিমা তো একতিলও মরে নাই।

ব্যাকুলভাবে কহিল, “দিদি, তোমরা আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ। এই দেখো, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি”

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন, না, মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশংকরবাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন-- তিনি জোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন, “ছোটোবউমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ। আমরা কি তোমার পর। তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল ‘কাকিমা কাকিমা’ করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও-- আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব।”

তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি”

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন বলিল, “এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি”

শারদাশংকর মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন-- খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল, দুই মূর্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল।

তখন কাদম্বিনী “ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই”-- বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে--
মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদস্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।

শ্রাবণ, ১২৯৯

স্বর্ণমুগ

আদ্যানাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী দুই শরিকা উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহবাক্য দিয়া তৎপরিবর্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবনসমুদ্রে সেই কাগজ-কখানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যানাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়বুদ্ধির আর-একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্তকন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ-কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উদ্ভেজনা য় ছিপ ঘুড়ি লাটাই নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছেলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণ পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য, এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না।

পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড়ো বড়ো পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডীমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছুরি এবং একখণ্ড

গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়াহ্নকাল পর্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন, এমন প্রায় দেখা যাইত।

যষ্ঠীর প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যনাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়। ও-বাড়ির বিদ্যাবাসিনীর যেমন গহনাপত্র, বেনারসী শাড়ি, কথাবার্তার ভঙ্গী এবং চালচলনের গৌরব, মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না, ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কী হইতে পারে। অথচ একই তো পরিবার। ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই তো উহাদের এত উন্নতি। যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজ শৃঙ্গুরের প্রতি এবং শৃঙ্গুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না। নিজ গৃহের কিছুই তাঁহার ভালো লাগে না। সকলই অসুবিধা এবং মানহানি-জনক। শয়নের খাটটা মৃতদেহবহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাতকুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চামচিকেশোবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না এবং গৃহসজ্জা দেখিলে ব্রহ্মচারী পরমহংসের চক্ষেও জল আসে। এ-সকল অত্যাচারের প্রতিবাদ করা পুরুষের ন্যায় কাপুরুষজাতির পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ছড়ি চাঁচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিতারণ নহে। এক-একদিন স্বামীর শিল্পকার্যে বাঁধা দিয়া গৃহিণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন। অত্যন্ত গভীরভাবে অন্যদিকে চাহিয়া বলিতেন, “গোয়ালার দুধ বন্ধ করিয়া দাও।”

বৈদ্যনাথ ক্রিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নম্রভাবে বলিতেন, “দুধটা-- বন্ধ করিলে কি চলিবে। ছেলেরা খাইবে কী।”

গৃহিণী উত্তর করিতেন, “আমানি।”

আবার কোনোদিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইত-- গৃহিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিতেন, “আমি জানি না। যা করিতে হয় তুমি করো”

বৈদ্যনাথ স্তানমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন, “কী করিতে হইবে?”

স্ত্রী বলিতেন, “এ মাসের মতো বাজার করিয়া আনো” বলিয়া এমন একটা ফর্দ দিতেন যাহাতে একটা রাজসূয়যজ্ঞ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত।

বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্বক প্রশ্ন করিতেন, ‘এত কি আবশ্যক আছে,’ উত্তর শুনিতেন, ‘তবে ছেলেগুলো না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব সস্তায় সংসার চালাইতে পারিবে’

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা-কিছু উপায় করা চাই। চাকরি করা অথবা ব্যাবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, “হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেন্ট ঔষধ বলিয়া দাও, কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব”

সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ‘বিধবাবিবাহ করিব’ বলিয়া একান্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। অর্থাভাবসত্ত্বে উপযুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া বৈদ্যনাথ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন ; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। তাহার কী একটা চূড়ান্ত জবাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছুতেই মাথায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে ; এবং কেন যে তাঁহার স্ত্রীর বিধবাবিবাহ হইতে পারে না, তাহার সদুত্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সেজন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ তৈরি করিতেছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল।

সেই মুহূর্তেই বিদ্যুতের মতো বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল মূর্তি দেখিতে পাইলেন। সন্ধ্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর-অভ্যর্থনা ও আহাৰ্য জোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন, সন্ধ্যাসী সোনা তৈরি করিতে পারে এবং সে-বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও সে অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে, তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোনা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্যন্ত সোনায় মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিদ্যাবাসিনীকে নিমন্ত্ৰণ করিলেন।

সন্ধ্যাসী প্রতিদিন দুই সের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড়সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানির কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাটাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরে ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফুলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কৰ্তা গৃহিণী কাহারো দ্রক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তুষিত একগ্রনেত্রে অবিশ্রাম অগ্নিশিখার প্রতিবিশ্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণপ্রাপ্ত হইল। দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্যাস্তপথের মতো জ্বলন্ত সুবর্ণপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানির কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আছতি দেওয়ার পর একদিন সন্ধ্যাসী আশ্বাস দিল, “কাল সোনার রঙ ধরিবো”

সেদিন রাত্রে আর কাহারো ঘুম হইল না ; স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সুবর্ণপুরী নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই। পরস্পর পরস্পরের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছু পরিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্তত করেন নাই, সে রাত্রে দাম্পত্য-একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সন্ধ্যাসীর দেখা নাই। চার দিক হইতে সোনার রঙ ঘুচিয়া গিয়া সূর্যকিরণ পর্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এখন হইতে গৃহকার্যে বৈদ্যনাথ কোনো-একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুরস্বরে বলেন, “বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ, এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাকো।” বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এমনি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে একমূহূর্তের জন্যও আশ্রুত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর হাস্যবিকাশপূর্বক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “কি আনিয়াছি বলো দেখি।”

স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন, “কেমন করিয়া বলিব, আমি তো আর ‘জান’ নহি।”

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন, তার পর ফুঁ দিয়া কাগজের ধুলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্ট স্টুডিয়ার রঙকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন।

গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিদ্যাবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতি তেলের ছবি মনে পড়িল-- অপরিাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন, “আ মরে যাই। এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ করোগো। এ আমার কাজ নাই।” বিমর্ষ বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন জোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকেই হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠী দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময়

পরিণামের জন্যই তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহলনিবৃত্তি হইল না।

শুনিলেন তাঁহার সম্ভানভাগ্য ভালো, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে ; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না।

অবশেষে একজন গনিয়া বলিল, বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজিপুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবো। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গণৎকার তো প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্বল হইয়া উঠিল। ধন উপার্জনের কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি, ব্যাবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈবধন উপার্জনের সেরূপ কোনো নির্দিষ্ট উপায় নাই। এইজন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভরসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোনোদিকে রাস্তা দেখিতে পান না। কোন্‌খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্‌ পুকুরে ডুবুরি নামাইবেন, বাড়ির কোন্‌ প্রাচীরটা ভাঙিতে হইবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষমানুষের মাথায় যে মস্তিষ্কের পরিবর্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার পূর্বে ধারণা ছিল না।

বলিলেন, “একটু নড়িয়াচড়িয়া দেখো। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে।”

কথাটা সংগত বটে এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্‌ দিকে নড়িবেন, কিসের উপর চড়িবেন, তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না। অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু, কুমড়া, শুস্ক নারিকেল, টিনের বাস্কের মধ্যে ছেলেদের জন্য জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্য এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নারিকেল তৈল।

মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, পক্ষপ্রায় ধান্যক্ষেত্র থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির সির করিয়া উঠিতেছে-- এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটি পাকানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখেন এবং তাঁহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাংলাদেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করেন এবং মনে মনে বলেন, “বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছেন।”

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমা নির্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যানাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্বক গ্রেফতার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিষ্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলেদুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়োটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁরে অবু, এবার পুজোর সময় কী চাস বল্ দেখি।”

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “একটা নৌকো দিয়ো বাবা।”

ছোটোটিও মনে করিল, বড়ো ভাইয়ের চেয়ে কোনো বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল, “আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো বাবা।”

বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্মণ্য কারুকার্য পাইলে আর-কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন, “আচ্ছা।”

এদিকে যথাকালে পূজার ছুটিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খুড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকিল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন, “ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে।”

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বুঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠী হইতে আবিষ্কার করিয়াছে ; সহধর্মিণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সদগতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।

পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি যে কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন, “কী সর্বনাশ। আমি কাশী যাইতে পারিব না।”

বৈদ্যনাথ কখনো ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কী করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন, স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে ‘অশিক্ষিত পটুত্ব’ আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার ধোঁয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন দুই-তিন গেলে বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলো কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া দুইখানি খেলনার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া পাল আঁটিয়া দিলেন ; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহু যত্ন এবং আশ্চর্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিন্তাচঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব বৈদ্যনাথ সপ্তমীর পূর্বরাত্রে যখন নৌকাদুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন, তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একে তো নৌকার খোলটাই যথেষ্ট,

তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড়ি আছে, মাজুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলনাদুটো কাড়িয়া জানলার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে। তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্মাণ।

ছোটো ছেলে তো উর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। ‘বোকা ছেলে’ বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড়ো ছেলেটি বাপের মুখের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভানমাত্র করিয়া কহিল, “বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়া কুড়িয়ে নিয়ে আসব।”

বৈদ্যনাথ তাহার পরদিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়। তাঁহার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোনা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সান্ত্রানেত্রি বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়শ্বশুরের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণেই বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্ছম্ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বলাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন।

কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল, তখন কোথা হইতে একটা ঝন্ঝন্ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাঙারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে।

বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল, কৌতূহল হইল এবং সেইসঙ্গে দুর্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিতহস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে-- ওঘরে গেলে মনে হয় এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে, অথচ কোন্ দিক হইতে আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না; ভয় হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়। ত্ব্ষিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কান খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে ত্ব্ষা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে-- বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্নিগ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখান্বিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিতনেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালাকার মতো একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝেময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্তী ছোটো কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন নীচে একটা ঘরের মতো আছে-- কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন-- অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দূরে যাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শুনা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে আহ্বাদি করিলেন। আহ্বারান্তে ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্‌ছল্ এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিস্কার শুনা গেল।

ভয়ে ভয়ে গর্তের কাছে আস্তে আস্তে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন, অনতিউচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে-- অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড়ো লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল একহাঁটুর অধিক নহে। একটি দিয়াশলাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে একমুহূর্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এইজন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকগুলি দেশালাই নষ্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বলিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিক্লিতে একটি বৃহৎ তাঁবার কলসি বাঁধা রহিয়াছে, এক-একবার জলের স্রোত প্রবল হয় এবং শিকলি কলসির উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছপ্‌ছপ্ শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসির কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসি শূন্য।

তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না-- দুই হস্তে কলসি তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছুই নাই। উপুড় করিয়া ধরিলেন।

কিছুই পড়িল না। দেখিলেন কলসির গলা ভাঙা। যেন এককালে এই কলসির মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, কে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মতো হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দমস্তরের মধ্যে হাতে কী একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা-- সেটাও একবার কানের কাছে লইয়া ঝাঁকাইলেন-- ভিতরে কিছুই নাই। ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন, নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙা ; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে, এবং তাহার পূর্ববর্তী যে-ব্যক্তির কোষ্ঠীতে দৈবধনলাভ লেখা ছিল, সেও সম্ভবত এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া ‘মা’ বলিয়া মস্ত একটা মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন-- প্রতিধ্বনি যেন অতীতকালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাভীর্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্বাস্ত্রে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মতো শূন্য বোধ হইল।

আবার যে জিনিসপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্বিতগুণা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে, সে তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মতো খুপ করিয়া ভাঙিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু তবু সেই জিনিসপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে

ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন-- তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্বপ্রথমে বি তঁাহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল-- ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙিয়া গেল, আবার যেন তঁাহার সেই পূর্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শুষ্কমুখে স্নান হাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাত্রির মতো নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তারপর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন আছা”

স্ত্রী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইল।”

বৈদ্যনাথ নিরন্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভারি শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। বীর কাছে গিয়া বলিল, “সেই নাপিতের গল্প বল্” বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কী একটা যেন হুম্ হুম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁটদুটি ক্রমশই বজ্রের মতো আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোনো স্বপ্ন হইতে জাগিয়া, বৈদ্যনাথের বড়োছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, “বাবা”

তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত উর্ধ্বকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল, “বাবা” কিন্তু কোনো উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

পূর্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশিগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৯৯

রীতিমত নভেল

প্রথম পরিচ্ছেদ

‘আল্লা হো আকবর’ শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিনলক্ষ যবনসেনা, অন্যদিকে তিনসহস্র আর্যসৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশুখবৃক্ষের মতো হিন্দুবীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল কিন্তু এইবার ভাঙিয়া পড়িবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেইসঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে এবং আজিকার ঐ অস্তাচলবর্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে।

হর হর বোম্ বোম্! পাঠক বলিতে পার, কে ঐ দৃষ্ট যুবা পয়ত্রিশজন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিষ্কিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবনসৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল?-- কাহার বজ্রমন্দিত ‘হর হর বোম্ বোম্’ শব্দে তিনলক্ষ স্লেচ্ছকণ্ঠের ‘আল্লা হো আকবর’ ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল? কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেঘযুথের ন্যায় শত্রুসৈন্য মুহূর্তের মধ্যে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হইল? বলিতে পার, সেদিনকার আর্যস্থানের সূর্যদেব সহস্ররক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ত তরবারিকে আশীর্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন? বলিতে পার কি পাঠক।

ইনিই সেই ললিতসিংহা কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্রুবনক্ষত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজ কাঞ্চীনগরে কিসের এত উৎসব। পাঠক জান কি। হর্ম্যশিখরে জয়ধ্বজা কেন এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

কেবল কি বায়ুভরে না আনন্দভরে। দ্বারে দ্বারে কদলীতরু ও মঙ্গলঘট, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি। পথে পথে দীপমালা। পুরপ্রাচীরের উপর লোকে লোকারণ্য। নগরের লোক কাহার জন্য এমন উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা পুরুষকণ্ঠের জয়ধ্বনি এবং বামাকণ্ঠের হলুধ্বনি একত্র মিশ্রিত হইয়া অভভেদ করিয়া নির্নিমেয় নক্ষত্রলোকের দিকে উদ্ভিত হইল। নক্ষত্রশ্রেণী বায়ুবাহত দীপমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

ঐ যে প্রমত্ত তুরঙ্গমের উপর আরোহণ করিয়া বীরবর পুরদ্বারে প্রবেশ করিতেছেন, উঁহাকে চিনিয়াছ কি। উনিই আমাদের সেই পূর্বপরিচিত ললিতসিংহ, কাঞ্চীর সেনাপতি। শত্রু নিধন করিয়া স্থায় প্রভু কাঞ্চীরাজ-পদতলে শত্রুরক্তাঙ্কিত খড়্গ উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাই এত উৎসব।

কিন্তু এত যে জয়ধ্বনি, সেনাপতির সেদিকে কর্ণপাত নাই-- গবাক্ষ হইতে পুরললনাগণ এত যে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন, সেদিকে তাঁহার দৃকপাত নাই। অরণ্যপথ দিয়া যখন তৃষাতুর পথিক সরোবরের দিকে ধাবিত হয় তখন শুষ্ক পত্ররাশি তাঁহার মাথার উপর ঝরিতে থাকিলে তিনি কি দ্রক্ষেপ করেন। অধীরচিত্ত ললিতসিংহের নিকট এই অজস্র সম্মান সেই শুষ্ক পত্রের ন্যায় নীরস, লঘু ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

অবশেষে অশ্ব যখন অন্তঃপুরপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন মুহূর্তের জন্য সেনাপতি তাঁহার বল্গা আকর্ষণ করিলেন, অশ্ব মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইল, মুহূর্তের জন্য ললিতসিংহ একবার প্রাসাদবাতায়নে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মুহূর্তের জন্য দেখিতে পাইলেন দুইটি লজ্জানত নেত্র একবার চকিতের মতো তাঁহার মুখের উপর পড়িল এবং দুইটি অনিন্দিত বাহু হইতে একটি পুষ্পমালা খসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে নামিয়া সেই মালা কিরীটচূড়ায় তুলিয়া লইলেন এবং আর-একবার কৃতার্থ দৃষ্টিতে উর্ধ্বে চাহিলেন। তখন দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দীপ নির্বাপিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহস্র শত্রুর নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেত্রের নিকট সে পরাভূত। সেনাপতি বহুকাল ধৈর্যকে পাষণদুর্গের মতো হৃদয়ে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, গতকাল সন্ধ্যাকালে দুটি কালো চোখের সলজ্জ সসম্ভ্রম দৃষ্টি সেই দুর্গের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং এতকালের ধৈর্য মুহূর্তে ভূমিসাৎ হইয়া গেছে। কিন্তু, ছি ছি সেনাপতি, তাই বলিয়া কি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মতো রাজাস্তঃপুরের উদ্যানপ্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হয়। তুমিই না ভুবনবিজয়ী বীরপুরুষ ?

কিন্তু যে উপন্যাস লেখে, তাহার কোথাও বাধা নাই ; দ্বারীরা দ্বাররোধ করে না, অসূর্যস্পর্শরূপা রমণীরাও আপত্তি প্রকাশ করে না। অতএব এই সুরম্য বসন্তসন্ধ্যায় দক্ষিণবায়ুবীজিত রাজাস্তঃপুরের নিভৃত উদ্যানে একবার প্রবেশ করা যাক-- হে পাঠিকা, তোমরাও আইস এবং পাঠকগণ, ইচ্ছা করিলে তোমরাও অনুবর্তী হইতে পার-- আমি অভয়দান করিতেছি।

একবার চাহিয়া দেখো, বকুলতলের তৃণশয্যায় সন্ধ্যাতারার প্রতিমার মতো ঐ রমণী কো হে পাঠক, হে পাঠিকা, তোমরা উঁহাকে জান কি। অমন রূপ কোথাও দেখিয়াছ ? রূপের কি কখনো বর্ণনা করা যায়। ভাষা কি কখনো কোনো মন্ত্ৰবলে এমন জীবন, যৌবন এবং লাভণ্যে ভরিয়া উঠিতে পারে। হে পাঠক, তোমার যদি দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় তবে স্ত্রীর মুখ স্মরণ করো। হে রূপসী পাঠিকা, যে যুবতীকে দেখিয়া তুমি সঙ্গিনীকে বলিয়াছ ‘ইহাকে কী এমন ভালো দেখিতে, ভাই। হউক সুন্দরী কিন্তু ভাই, তেমন শ্রী নাই’--তাহার মুখ মনে করো, ঐ তরুতলবর্তিনী রাজকুমারীর সহিত তাহার কিষ্কিৎ সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবো পাঠক এবং পাঠিকা, এবার চিনিলে কি। উনিই রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা।

রাজকুমারী কোলের উপর ফুল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন, সহচরী কেহই নাই। গাঁথিতে গাঁথিতে এক-একবার অঙ্গুলি আপনার সুকুমার কার্যে শৈথিল্য করিতেছে, উদাসীন দৃষ্টি কোন্-এক অতিদূরবর্তী চিন্তারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কী ভাবিতেছেন।

কিন্তু হে পাঠক, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। কুমারীর নিভৃত হৃদয়মন্দিরের মধ্যে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কোন্ মর্ত্যদেবতার আরতি হইতেছে, অপবিত্র কৌতূহল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ঐ দেখো, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পূজার সুগন্ধি ধূপধূমের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশাইয়া গেল এবং দুইফোঁটা অশ্রুজল দুটি সুকোমল কুসুমকোরকের মতো অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে খসিয়া পড়িল।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে একটি পুরুষের কণ্ঠ গভীর আবেগভরে কম্পিত রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, “রাজকুমারী”

রাজকন্যা সহসা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চারি দিক হইতে প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া অপরাধীকে বন্দী করিল। রাজকন্যা তখন পুনরায় সংজ্ঞা হইয়া দেখিলেন, সেনাপতি বন্দী হইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ অপরাধে প্রাণদণ্ডই বিধান। কিন্তু পূর্বোপকার স্মরণ করিয়া রাজা তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। সেনাপতি মনে মনে কহিলেন, ‘দেবী, তোমার নেত্রও যখন প্রতারণা করিতে পারে, তখন সত্য পৃথিবীতে কোথাও নাই। আজ হইতে আমি মানবের শত্রু’ একটি বৃহৎ দস্যুদলের অধিপতি হইয়া ললিতসিংহ অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

হে পাঠক, তোমার আমার মতো লোক এইরূপ ঘটনায় কী করিত। নিশ্চয় যেখানে নির্বাসিত হইত সেখানে আর-একটা চাকরির চেষ্টা দেখিত, কিম্বা একটা নূতন খবরের কাগজ বাহির করিত। কিছু কষ্ট হইত সন্দেহ নাই-- সে অন্নাভাবো কিন্তু সেনাপতির মতো মহৎ লোক, যাহারা উপন্যাসে সুলভ এবং পৃথিবীতে দুর্লভ, তাহারা চাকরিও করে না, খবরের কাগজও চালায় না। তাহারা যখন সুখে থাকে তখন একনিশ্বাসে নিখিলজগতের উপকার করে এবং মনোবাঞ্ছা তিলমাত্র ব্যর্থ হইলেই আরক্তলোচনে বলে, “রাক্ষসী পৃথিবী, পিশাচ সমাজ, তোদের বুকো পা দিয়া আমি ইহার প্রতিশোধ লইব।” বলিয়া তৎক্ষণাৎ

দস্যুব্যবসায় আরম্ভ করে। এইরূপ ইংরেজি কাব্যে পড়া যায় এবং অবশ্যই এ প্রথা রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দস্যুর উপদ্রবে দেশের লোক ব্রন্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অসামান্য দস্যুরা অনাথের সহায়, দরিদ্রের বন্ধু, দুর্বলের আশ্রয়, কেবল, ধনী উচ্চকুলজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজকর্মচারীদের পক্ষে কালান্তক যম।

ঘোর অরণ্য, সূর্য অস্তপ্রায়া। কিন্তু বনচ্ছায়ায় অকালরাত্রির আবির্ভাব হইয়াছে। তরুণ যুবক অপরিচিত পথে একাকী চলিতেছে। সুকুমার শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তথাপি অধ্যবসায়ের বিরাম নাই। কটিদেশে যে তরবারি বদ্ধ রহিয়াছে, তাহারই ভার দুঃসহ বোধ হইতেছে। অরণ্যে লেশমাত্র শব্দ হইলেই ভয়প্রবণ হৃদয় হরিণের মতো চকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি এই আসন্ন রাত্রি এবং অজ্ঞাত অরণ্যের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দস্যুরা আসিয়া দস্যুপতিকে সংবাদ দিল, “মহারাজ, বৃহৎ শিকার মিলিয়াছে। মাথায় মুকুট, রাজবেশ, কটিদেশে তরবারি।”

দস্যুপতি কহিলেন, “তবে এ শিকার আমরা তোরা এখানেই থাক্।”

পথিক চলিতে চলিতে সহসা একবার শুষ্ক পত্রের খস্‌খস্‌ শব্দ শুনিতে পাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিল।

সহসা বৃকের মাঝখানে তীর আসিয়া বিঁধিল, পান্থ ‘মা’ বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্যুপতি নিকটে আসিয়া জানু পাতিয়া নত হইয়া আহতের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভূতলশায়ী পথিক দস্যুর হাত ধরিয়া কেবল একবার মৃদুস্বরে কহিল, “ললিতা” মুহূর্তে দস্যুর হৃদয় যেন সহস্র খণ্ডে ভাঙিয়া এক চীৎকারশব্দ বাহির হইল, “রাজকুমারী।”

দস্যুরা আসিয়া দেখিল শিকার এবং শিকারী উভয়েই অস্তিম আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে।

রাজকুমারী একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্তঃপুরের উদ্যানে অজ্ঞানে ললিতের উপর রাজদণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ললিত আর-একদিন সন্ধ্যাকালে

অরণ্যের মধ্যে অজ্ঞানে রাজকন্যার প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। সংসারের বাহিরে
যদি কোথাও মিলন হইয়া থাকে তো আজ উভয়ের অপরাধ উভয়ে বোধ করি
মার্জনা করিয়াছে।

ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৯৯

জয়পরাজয়

১

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখনো চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যেদিন কোনো নূতন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন, সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের বাতায়নবর্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোনো-এক অগম্য নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে আপনার সংগীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন যেখানে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীবনের একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখনো ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখনো নূপুরশিঞ্জনের মতন শুনা যাইত ; বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোনার নূপুর বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে। সেই দুইখানি রক্তিম শুভ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কী সৌভাগ্য কী অনুগ্রহ কী করুণার মতো করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণদুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং সেই নূপুরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু যে-ছায়া দেখিয়াছিল, যে-নূপুর শুনিয়াছিল, সে কাহার ছায়া, কাহার নূপুর, এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভক্তহৃদয়ে কখনো উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জুরী যখন ঘাটে যাইত, শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সঙ্গে তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নির্জন দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যায় শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল, এমনও বোধ হইত না, যদিবা আবশ্যক ছিল এমন হয় কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে

একটু বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙিন কাপড় এবং কানে দুইটা আম্রমুকুল পরিবার কোনো উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কানাকানি করিত। লোকের কোনো অপরাধ ছিল না। মঞ্জরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না।

তাহার নাম ছিল মঞ্জরী ; বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নামই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরো একটু কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসন্তমঞ্জরী বলিতেন। লোকে শুনিয়া বলিত, “আ সর্বনাশা”

আবার কবির বসন্তবর্ণনার মধ্যে ‘মঞ্জুলবঞ্জুলমঞ্জরী’ এমনতরো অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমন-কি, জনরব রাজার কানেও উঠিয়াছিল।

রাজা তাঁহার কবির এইরূপ রসাধিক্যের পরিচয় পাইয়া বড়োই আমোদবোধ করিতেন-- তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন।

রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, “ভ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভায় গান গায়--”

কবি উত্তর দিতেন, “না, পুষ্পমঞ্জরীর মধুও খাইয়া থাকে”

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আমোদ করিত ; বোধ করি অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিবেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন একরকম করিয়া কাটিয়া যায়-- খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয় ; জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া-- প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে-গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ-- সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল-- এবং সেই গানের যথার্থ্য অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্যন্ত সকলেই

আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই, অমনি দেশের চতুর্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত-- তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এইভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেলা কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শুনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত-- এবং অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে কখনো কখনো একটা ছায়া পড়িত, কখনো কখনো একটা নূপুর শূন্য যাইত।

২

এমন সময়ে দক্ষিণাত্য হইতে এক দিগিজয়ী কবি শাদুলবিক্রীড়িত হৃন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন, “এহি, এহি”

কবি পুণ্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন, “যুদ্ধং দেহি”

রাজার মান রাখিতে হইবে, যুদ্ধ দিতে হইবে, কিন্তু কাব্যযুদ্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালোরূপ ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশস্বী পুণ্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ বক্র নাসা এবং দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক দিগ্বিদিকে অঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহৃদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রত্যুষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই ; নগরে আর-সমস্ত কাজকর্ম একেবারে বন্ধ।

কবি শেখর বহুকষ্টে মুখে সহাস্য প্রফুল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পুণ্ডরীককে নমস্কার করিলেন ; পুণ্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত

ইঙ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবর্তী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

শেখর একবার অন্তঃপুরের বাতায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন--
বুঝিতে পারিলেন, সেখান হইতে আজ শত শত কৌতূহলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার
বাগ্ৰদৃষ্টি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে
চিন্তকে সেই উর্ধ্বলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া
আসিলেন, মনে মনে কহিলেন, ‘আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবি, হে
অপরাজিতা, তাহাতে তোমারই নামের সার্থকতা হইবে।’

তুরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।
শুল্কবসন রাজা উদয়নারায়ণ শরৎপ্রভাতের শুভ্র মেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে
সভায় প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

পুণ্ডরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃহৎ সভা স্তব্ধ
হইয়া গেল। বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ উর্ধ্বে হেলাইয়া বিরাটমূর্তি
পুণ্ডরীক গম্ভীরস্বরে উদয়নারায়ণের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর
ঘরে ঘরে না-- বৃহৎ সভাগৃহের চারি দিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের
তরঙ্গের মতো গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই
ধ্বনির বেগে সমস্ত জনমণ্ডলীর বক্ষকবাট খর্ খর্ করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল।
কত কৌশল, কত কারুকার্য, উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা, রাজার
নামাক্ষরের কতদিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক।

পুণ্ডরীক যখন শেষ করিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগৃহ
তাঁহার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ও সহস্র হৃদয়ের নির্বাক্ বিস্ময়রাশিতে গম্ গম্
করিতে লাগিল। বহু দূরদেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া
উচ্ছ্বসিত স্বরে ‘সাধু সাধু’ করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা একবার শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন।
শেখরও ভক্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সাকরুণ সংকোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার
দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন লোকরঞ্জনার্থে

দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা করিতে চাওয়াছিলেন, তখন সীতা যেন এইরূপভাবে চাওয়া এমনি করিয়া তাঁহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কবির দৃষ্টি নীরবে রাজকে জানাইল, “আমি তোমারই। তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাওয়া পরীক্ষা করিতে চাও তো করো। কিন্তু--” তাহার পরে নয়ন নত করিলেন।

পুণ্ডরীক সিংহের মতো দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারি দিকে ব্যাধবেষ্টিত হরিণের মতো দাঁড়াইল। তরুণ যুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহ-কোমল মুখ, পাণ্ডুবর্ণ কপোল, শরীরাত্মক নিতান্ত স্বপ্ন, দেখিলে মনে হয় ভাবের স্পর্শমাত্রের সমস্ত দেহ যেন বীণার তারের মতো কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মুখ না তুলিয়া প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধ হয় কেহ ভালো করিয়া শুনিতো পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন-- যেখানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজসভার পায়ণপ্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদূরবর্তী অতীতের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুমিষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় উর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপুরুষের কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুদ্ধবিগ্রহ, শৌর্যবীর্য, যজ্ঞদান, কত মহদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দূরস্মৃতিবদ্ধ দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহৃদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে মূর্তিমান করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাওয়া দিলেন-- যেন দূরদূরান্ত হইতে শতসহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া রাজপিতামহদিগের এই অতিপুরাতন প্রাসাদকে মহাসংগীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল-- ইহার প্রত্যেক ইষ্টককে যেন তাহারা স্পর্শ করিল, আলিঙ্গন করিল, চুষন করিল, উর্ধ্বে অন্তঃপুরের বাতায়নসম্মুখে উত্তীর্ণ হইয়া রাজলক্ষ্মীস্বরূপা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে স্নেহদ্রব্ধ ভক্তিভরে লুপ্তিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহামহোন্মাদে শতশতবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন, “মহারাজ, বাক্যতে

হার মানিতে পারি, কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবো” এই বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয়া পড়িলেন। তখন অশ্রুজলে-অভিযুক্ত প্রজাগণ ‘জয় জয়’ রবে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমণ্ডলীর এই উন্মত্ততাকে ধিক্কারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃগুগর্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে” সকলে একমূহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন তিনি নানা ছন্দে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন-- বিশ্বের মধ্যে বাক্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। বাক্যই সত্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ, অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়ো। ব্রহ্মা চারি মুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না-- পঞ্চানন পাঁচ মুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন।

এমনি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভভেদী সিংহাসন নির্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্যলোক এবং সুরলোকের মস্তকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্বীর বজ্রনিদানে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে”

দর্পভরে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন ; যখন কেহ কোনো উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। পাণ্ডিত্যগণ ‘সাধু সাধু’ ‘ধন্য ধন্য’ করিতে লাগিল-- রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপুল পাণ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মতো সভাভঙ্গ হইল।

৩

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন-- বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে, তখনো গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল, জানে না কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল দক্ষিণপবনে বাজিতেছে, একবার মনে হইল উত্তরে গিরিগোবর্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে ; মনে হইল, উদয়াচলের

উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে ; মনে হইল, অস্ত্রাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে ; মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল ; মনে হইল, আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র-- অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল-- বাঁশি কী বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কী বলিতে চাহে, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না ; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ-অপযশ জয়পরাজয় উত্তর-প্রত্যুত্তর সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার নির্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ময়ী মানসী মূর্তি, কেবল কানে বাজিতেছিল দুটি কমলচরণের নূপুরধ্বনি। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মতো বসিয়া পড়িলেন তখন একটি অনির্বাচনীয় মাধুর্যে-- একটি বৃহৎ ব্যাপ্ত বিরহব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পুণ্ডরীক সিংহাসনসম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন, “রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কো” বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কো” বলিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য বিস্তার করিয়া আপনি তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন, “রাধা প্রণব ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যানযোগ, এবং বৃন্দাবন দুই দ্বার মধ্যবর্তী বিন্দু।” ইড়া, সুবৃন্দা, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হংপদ্ম, ব্রহ্মরজ্জ্ব, সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। ‘রা’ অর্থেই বা কী, ‘ধা’ অর্থেই বা কী, কৃষ্ণ শব্দের ‘ক’ হইতে মূর্ধ্য ‘ণ’ পর্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে, তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার বুঝাইলেন, কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অগ্নি, একবার বুঝাইলেন, কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা যজ্ঞদর্শন ; তাহার

পরে বুঝাইলেন কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা ; রাধিকা উত্তরপ্রত্যুত্তর, কৃষ্ণ জয়লাভ।

এই বলিয়া রাজার দিকে, পণ্ডিতের দিকে এবং অবশেষে তীব্র হাস্য শেখরের দিকে চাহিয়া পুণ্ডরীক বসিলেন।

রাজা পুণ্ডরীকের আশ্চর্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না এবং কৃষ্ণরাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশির গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল ; যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সবুজ রঙটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এতদিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন ; ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।

৪

পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং দ্বিসমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্য, সৌত্র, চক্র, পদ্য, কাকপদ, আদ্যুত্তর, মধ্যোত্তর, অন্ত্যোত্তর, বাক্যোত্তর, শ্লোকোত্তর, বচনগুপ্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুতদত্তাক্ষর, অর্থগূঢ়, স্তুতিনিন্দা, অপহুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শাস্ত্রী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন। শুনিয়া সভাসুদ্ধ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না।

শেখর যে-সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল-- তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্বসাধারণে ব্যবহার করিত-- আজ তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহাতে কোনো গুণগণনা নাই, যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না-- নহিলে কথাগুলো বিশেষ নূতনও নহে দুরূহও নহে, তাহাতে পৃথিবীর লোকের নূতন একটা শিক্ষাও হয় না সুবিধাও হয় না-- কিন্তু আজ যাহা শুনিল তাহা অদ্ভুত ব্যাপার, কাল যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গুঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দিকবর্তী সভাস্থ জনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।

আজ শেষ দিন। আজ জয়পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কবির প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই, আজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলে চলিবে না-- তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

শেখর শান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই কথা বলিলেন, “বীণাপাণি শ্বেতভূজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণসঙ্ক যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কী গতি হইবে।” মুখ ঈষৎ উপরে তুলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভূজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজস্তুঃপূরে বাতায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন পুণ্ডরীক সশব্দে হাস্য করিলেন, এবং শেখর শব্দের শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শ্লোক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন, “পদ্মবনের সহিত খরের কী সম্পর্ক। এবং সংগীতের বিস্তর চর্চাসত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফললাভ করিয়াছে। আর সরস্বতীর অধিষ্ঠান তো পুণ্ডরীকেই, মহারাজের অধিকারে তিনি কী অপরাধ করিয়াছিলেন যে এদেশে তাঁহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা হইতেছে।”

পণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে যোগ দিল-- তাঁহাদের দেখাদেখি সভাসুদ্ধ সমস্ত লোক, যাহারা বুঝিল এবং না-বুঝিল, সকলেই হাসিতে লাগিল।

ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় রাজা তাঁহার কবিসখাকে বারবার অঙ্কুশের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেখর তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের

গলায় পরাইয়া দিলেন-- সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে এককালে অনেকগুলি বলয় কঙ্কণ নূপুরের শব্দ শুনা গেল-- তাহাই শুনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

৫

কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাষ্ঠমঞ্চ হইতে শেখর আপনার পুঁথিগুলি পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগুলি পৃথক করিয়া রাখিলেন। অনেকদিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগুলি রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি উলটাইয়া পালটাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার কাছে ইহা সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ‘সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়! কতকগুলো কথা এবং ছন্দ এবং মিল!’ ইহার মধ্যে যে কোনো সৌন্দর্য, মানবের কোনো চির-আনন্দ, কোনো বিশ্বেসংগীতের প্রতিধ্বনি, তাঁহার হৃদয়ের কোনো গভীর আত্মপ্রকাশ নিবদ্ধ হইয়া আছে-- আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোনো খাদ্যই রুচি না, তেমনি আজ তাঁহার হাতের কাছে যাহা কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হৃদয়ের দুরাশা, কল্পনার কুহক-- আজ অন্ধকার রাত্রে সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

তখন একটি একটি করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘বড়ো বড়ো রাজারা অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া থাকেন-- আজ আমার এ কাব্যমেধযজ্ঞ!’ কিন্তু তখনই মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয়

নাই। ‘অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্বত্র বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে তখনই অশ্বমেধ হয়-- আমার কবিত্ব যেদিন পরাজিত হইয়াছে, আমি সেইদিন কাব্যমেধ করিতে বসিয়াছি-- আরো বহুদিন পূর্বে করিলেই ভালো হইত।’

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগুলিই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত শূন্যে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন, ‘তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম-- হে সুন্দরী অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আত্মতা দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিলে, হে মোহিনী বহ্নিরূপিণী, যদি সোনা হইতাম তো উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম--কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবী, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।’

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। তিনি যে যে ফুল ভালোবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সবগুলি সাদা ফুল-- জুঁই বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা মুঠা লইয়া নির্মল বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারিদিকে প্রদীপ জ্বলাইলেন।

তাহার পর মধুর সঙ্গে একটা উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে পান করিলেন, এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।

নূপুর বাজিল। দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল।

কবি নিমীলিতনেত্রে কহিলেন, “দেবী, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি। এতদিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলো।”

একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন, “কবি, আসিয়াছি।”

শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন-- দেখিলেন, শয্যার সম্মুখে এক অপরূপ রমণীমূর্তি।

মৃত্যুসমাচ্ছন্ন বাম্পাকুলনেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল, তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, “আমি রাজকন্যা অপরাজিতা”

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন, “রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি”

বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্পমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

কার্তিক, ১২৯৯

কাবুলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেকসময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমনসময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, “বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিছু জানে না। না?”

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে ধ্যানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। “দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।”

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, “বাবা, মা তোমার কে হয়?”

মনে মনে কহিলাম শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, “মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর্গে যা। আমার এখন কাজ আছে।”

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে ‘আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম’ খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে হইয়া অন্ধকার রাতে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা”

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাস্ক, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল-- তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলিঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটোচোরটে জীবিত মানব-সন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল-- আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন, তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুস, ইংরেজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু, তোমার লড়কী কোথায় গেল?”

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম-- সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধ নৈরঞ্জেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না,

দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যিকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো আঁসলা বাংলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, “উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না” বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোলো-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চকচকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুই এ আধুলি কোথায় পেলি।”

মিনি বলিতেছে, “কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।”

তাহার মা বলিতেছেন, “কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি।”

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, “আমি চাই নি, সে আপনি দিলে।”

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তাবাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে-- যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।”

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, “হাঁতি।”

অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে, এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম। খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ-একটু কৌতুক অনুভব করিত-- এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, “খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখনু যাবে না।”

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল ‘শুশুরবাড়ি’ শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে, শিশু মেয়েকে শুশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা-কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উলটিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি শুশুরবাড়ি যাবে?”

রহমত কাল্পনিক শুশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আশ্ফালন করিয়া বলিত, “হামি সসুরকে মারবো।”

শুনিয়া মিনি শুশুর নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে। একটা

বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোটো ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর দুর্গম দক্ষ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাইকরা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে ; পাগড়িপরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটেরঞ্চপরে, কেহ বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্শা, কাহারো হাতে সেকেলে চকমকি-ঠোকা বন্দুক-- কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শক্তিত স্বভাবের লোক। রাত্ণায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শূঁয়াপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, “কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না। কাবুলদেশে কি দাসব্যাবসা প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব?”

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয়

রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাণ্ডনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না, সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই টিলেঢালা-জামা-পায়জামা-পরা, সেই ঝোলাবুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন দেখি, মিনি ‘কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা’ করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে, তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রুফশীট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্বে আজ দিন-দুইতিন হইতে শীতটা খুব কনকনে হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে-- মাথায়-গলবন্ধ-জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুইপাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে-- তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে

কিষ্টিং ধারিত-- মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় ‘কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা’ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি শিশুরবাড়ি যাবে?”

রহমত হাসিয়া কহিল, “সিখানেই যাচ্ছে”

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, “সসুরাকে মারিতাম কিন্তু, কী করিব, হাত বাঁধা”

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক, তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিত। এমন-কি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে।

কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতনধৌত রৌদ্র যেন সেহগায়গেলানো নির্মল সোনার মতো রঙ ধরিয়াছে। কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলির উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাভণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে ; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে ; হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, “কী রে রহমত, কবে আসিলি?”

সে কহিল, “কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।”

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট করিয়া উঠিল। কোনো খুনীকে কখনো প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাকে কহিলাম, “আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও”

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, “খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?”

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্বের মতো ‘কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা’ করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনোরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমন-কি, পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে একবাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্মিস বাদাম বোধ করি কোনো স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়াচিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল-- তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম, “আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না”

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে ‘বাবু সেলাম’ বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, “এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিস্মিস বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেনা”

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, “আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে-- আমাকে পয়সা দিবেন না--

“বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না”

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত ঢালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে একটুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সময়ে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে-- যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চয় করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম-- তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জ ভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, “খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস ?”

মিনি এখন শৃঙ্গুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না-- রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে-- তাহাকে ঠিক

পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরু-পর্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম বলিলাম, “রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও ; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।”

এই টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণ, ১২৯৯

ছুটি

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল, নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাজুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল ; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবো।

যে-ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যিককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল ; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীণ্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না ; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আশ্বালন করিয়া কহিল, “দেখ, মার খাবি! এইবেলা ওঠ।”

সে তাহাতে আরো একটু নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল-
- সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনই উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু

বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে ; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর-কাহারো মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল-- ‘মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো’ গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাভীর গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হুস্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয়া ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমনসময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটা অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গৌঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়?”

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, “ঐ হোথা” কিন্তু কোন্‌দিকে যে নির্দেশ করিল কাহারো বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায়?”

সে বলিল, “জানি নো” বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, “ফটিকদাদা, মা ডাকছে”

ফটিক কহিল, “যাব না।”

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, “আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!”

ফটিক কহিল, “না, মারি নি।”

“ফের মিথ্যে কথা বলছিস!”

“কখখনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।”

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, “হাঁ, মেরেছে।”

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কবাইয়া দিয়া কহিল, “ফের মিথ্যে কথা!”

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, “অ্যা, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!”

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, “কী হচ্ছে তোমাদের।”

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, “ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলো।” বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহার অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে

প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অব্যাহত উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশাস্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, “ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে”

শুনিয়া বিশ্বস্তর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলিকাতায় যাবি?”

ফটিক লাফাইয়া উঠিল বলিল, “যাব”

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল-- কৌন্দির সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায় কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন। ‘কবে যাবে’, ‘কখন যাবে’ করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল ; উৎসাহে তাহার রাগে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগোঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বস্তরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদিঞ্চনকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্বেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধেআধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ

রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে ; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপপঞ্চান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুদ্ধিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না ; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনা অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারি দিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনোএক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত। মামি যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত-- অবশেষে মামি যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, “ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে। একটু পড়োগে যাও”-- তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামির এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নির্ধুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, ‘তাইরে নাইরে নাইরে না’ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্থিনী, সেই-সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিন্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা-- কেবল একটা কাছে যাইবার অঙ্ক ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোপনিসময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক ‘মা মা’ ক্রন্দন-- সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জনালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত ; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে স্ফণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিন্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “মামা, মার কাছে কবে যাবা” মামা বলিয়াছিলেন, “স্কুলের ছুটি হোকা” কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ

স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, “বই হারিয়ে ফেলেছি”

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, “বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নো”

ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল-- সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল ; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সিরসি করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামির প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামি এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারো কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিনে আবার রাত্রি হইতে মুঘলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বস্তরবাবু পুলিশে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বস্তরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিশের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বস্তর-বাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাস্থে

কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামি তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও”

বাস্তবিক, সমস্তদিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহালাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিটমিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, “আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে”

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, “মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি”

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সন্মেনে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, “মা, আমাকে মারিস্ নে, মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করি নি”

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যালফ্যাল করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি”

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু জ্বিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, “এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে--এ-এ না” কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত ; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশৃঙ্খল বহুকণ্ঠে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিল, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, “ফটিক, সোনা, মানিক আমরা”

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, “অ্যাঁ”

মা আবার ডাকিলেন, “ওরে ফটিক, বাপধন রে”

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি”

পৌষ, ১২৯৯

সুভা

১

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবো। তাহার দুটি বড়ো বোনকে সুকেশিনী সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোটো মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড়ো দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটোটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মতো বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখনো ভোলো। পিতামাতার মনে সে সর্বদাই জাগরুক ছিল।

বিশেষত, তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপ দেখিতেন। কেননা, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপে দেখেন-- কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ, কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়েদের অপেক্ষা যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্কধ্বংস করিয়া তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল-- এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে-ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদের অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো ; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জমা করিতে হয় না-- মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে, ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত কখনো মুদিত হয়, কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো স্তলনভাবে নিবিয়া আসে, কখনো অন্তর্মান চন্দ্রের মতো অনিমেঘভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর-- অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তন্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

২

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো ; বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রসার নহে ; নিরলসা তনুী নদীটি আপন কুলরক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায় ; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট ; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুতপদক্ষেপে প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, টেকিশালা, খড়ের জুপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান নৌকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারো নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্মে যখনই অবসর পায় তখনই সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর, সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরাআন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা--বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে-ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার ; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাভীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজন মূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্ৰ মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত-- একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে আর-একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না, তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখনো শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিতে-- তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন তাহাদের আদর করিতেছে, কখন ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভালো বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাছুর দ্বারা সর্বশীর গ্রীবা বেঁটন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল ; গৃহে যেদিন কোনো কঠিন কথা শুনিত, সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত-- তাহার সহিষ্ণুতাপেরিপূর্ণ বিবাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কী একটা অন্ধ অনুমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত,

এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্বাক্ ব্যাকুলতার সহিত সান্থনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষভাবে মৈত্রী ছিল না, তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন-তখন সুভার গরম কোলটি নিঃসংকোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল আঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩

উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব ; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোটো ছেলেটি-- তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য। সে যে কাজকর্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে, বহু চেষ্টার পর বাপ-মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়-- কারণ, কোনো কার্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারি সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। শহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারি বাগান থাকা আবশ্যিক, তেমনি গ্রামে দুই-চারিটা অকর্মণ্য সরকারি লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজেকর্মে আমোদে-অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান শখ-- ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটানো যায়। অপরাহ্নে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে-কোনো কাজেই নিযুক্ত থাক, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভালো। মাছ ধরার সময়

বাক্যহীন সঙ্গীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-- এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর-একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে ‘সু’ বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত, প্রতাপের কোনো-এটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা-কোনো কাজে লাগিতে, কোনোমতে জানাইয়া দিতে যে এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত-- মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত, “তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না!”

মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত ; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত ; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত ; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে-- কে বসিয়া ?-- আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু-- আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব। আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোসাঁইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারিতেছে না।

৪

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে যেন কোনো-একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাআকে এক নূতন

অনির্বচনীয় চেতনা-শক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমারাত্রীে সে এক-একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমা-প্রকৃতিও সুভার মতো একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া-- যৌবনের রহস্যে পুলকে বিধাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন-কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্‌থম্‌ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রাপ্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এ দিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন-কি, একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের সচ্ছল অবস্থা, দুইবেলাই মাছভাত খায়, এ জন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মতো বাণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “চলো, কলিকাতায় চলো।”

বিদেশযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশাঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুস্বাপ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কাবশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্বাক্ জন্তুর মতো তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত-- ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কী একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্নে জলে ছিপ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, “কী রে, সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস? দেখিস, আমাদের ভুলিস্ নো” বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাখের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে ‘আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম’, সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়নগৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যসখীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল--
- দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্লদ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শম্পশয্যা লুটাইয়া পড়িল-- যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মুক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, “তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।”

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলংকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয়, এ জন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভৎসনা মানিল না।

বন্ধু-সঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন-- কন্যার মাবাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশবাস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জন গর্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন।

পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “মন্দ নহে।”

বিশেষত, বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার হৃদয় আছে এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে-হৃদয় আজ বাপমায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর-কোনো কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপমা দেশে চলিয়া গেল--
তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না, সেটা তাহার দোষ নহে সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারি দিকে চায়-- ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না-- বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল-- অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিলা।

মাঘ, ১২৯৯

মহামায়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরে সান্ধাৎ করিলা।

মহামায়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গস্তীর দৃষ্টি ঈষৎ ভ্রঁসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিষ্কেপ করিলা। তাহার মর্ম এই, তুমি কী সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ। আমি এ পর্যন্ত তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদূর স্পর্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে ?

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষৎ ভয় করিয়া চলে, তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল-- দুটো কথা গুছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা-কোনো-কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্রুত বলিয়া ফেলিল, “আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখানে হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি” রাজীবের যে-কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে-কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু যে-ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। কথাটা নিতান্ত নীরস নিরলংকার, এমন-কি, অদ্ভুত শুনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে খতমত খাইয়া গেল-- আরো দুটো-পাঁচটা কথা জুড়িয়া ওটাকে যে বেশ-একটু নরম করিয়া আনিবে, তাহার সামর্থ্য রহিল না। ভাঙা মন্দিরে নদীর ধারে এই মধ্যাহ্নকালে মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া নির্বোধ লোকটা সুন্দ্র কেবল বলিল, “চলো, আমরা বিবাহ করিগে!”

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রের মতো কাঁচাসোনার প্রতিমা--

সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।

তাহার বাপ নাই, বড়ো ভাই আছেন-- তাঁহার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাইবোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক-- মুখে কথাটি নাই কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে, দিবা দ্বিপ্রহরের মতো নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটি বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড়োসাহেব তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্মচারী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রের ভরণপোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটির কুঠিতে লইয়া আসেন। বালকের সঙ্গে কেবল তাহার স্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ইঁহারা ভবানীচরণের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বয়স ক্রমে ক্রমে যোলো, সতোরো, আঠারো, এমন-কি, উনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিস্তর অনুরোধসত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙালির ছেলের এরূপ অসামান্য সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ভারি খুশি হইলেন ; মনে করিলেন, ছেলেটি তাঁহাকেই আপনার জীবনের আদর্শস্থল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এদিকে সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অনুরূপ কুলসম্পন্ন পাত্র জোটে না। তাহারও কুমারী বয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, পরিণয়বন্ধন যে-দেবতার কার্য তিনি যদিও এই নরনারীযুগলের প্রতি এযাবৎ বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাঁহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নষ্ট করেন নাই। বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন ঢুলিতেছিলেন, যুবক কন্দর্প তখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।

ভগবান কন্দর্পের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দুটোচোরটে মনের কথা বলিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়, মহামায়া তাকে সে অবসর দেয় না-- তাহার নিস্তন্ধ গম্ভীর দৃষ্টি রাজীবের ব্যাকুল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া তোলে।

আজ শতবার মাথার দিব্য দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙা মন্দিরে আনিতে কৃতকার্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, যতকিছু বলিবার আছে আজ সব বলিয়া লইবে, তাহার পরে হয় আমরণ সুখ নয় আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন একটা সংকটের দিনে রাজীব কেবল কহিল, “চলো, তবে বিবাহ করা যাউক।” এবং তার পরে বিস্মৃতপাঠ ছাত্রের মতো খতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল। রাজীব যে এরূপ প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেকক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দিষ্ট করুণধ্বনি আছে, সেইগুলি এই নিস্তন্ধতায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্ধসংলগ্ন ভাঙা কবাট এক-একবার অত্যন্ত মৃদুমন্দ আর্তস্বর-সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল-- মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্ বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমূলগাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোকরা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে, শুষ্ক পত্ররাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সরসর্ শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণ বাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝরঝর্ করিয়া উঠে এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই-সমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরুতল হইতে একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া একপ্রকার শ্রান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মতো নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর-একবার ভিক্ষুকভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল, “না, সে হইতে পারে না।”

মহামায়ার মাথা যেমনি নড়িল রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত, মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মানুসারেই নড়ে, আর-কাহারো সাধ্য নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কত কাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে-- সে কি কখনো রাজীবের মতো অকুলীন ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে। ভালোবাসা এক এবং বিবাহ করা আরা। যাহা হউক, মহামায়া বুঝিতে পরিল, তাহার নিজের বিবেচনাহীন ব্যবহারেই রাজীবের এতদূর স্পর্ধা বাড়িয়াছে ; তৎক্ষণাৎ সে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাজীব অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, “আমি কালই এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি”

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে ভাবটা দেখাইবে-- সে খবরে আমার কী আবশ্যকা কিন্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না-- শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন”

রাজীব কহিল, “আমার সাহেব এখান হইতে সোনাপুরের কুঠিতে বদলি হইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।”

মহামায়া আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল, দুইজনের জীবনের গতি দুই দিকে-- একটা মানুষকে চিরদিন নজরবন্দি করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা চোঁট ঈষৎ খুলিয়া কহিল, “আচ্ছা” সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শুনাইল।

কেবল এই কথাটুকু বলিয়া মহামায়া পুনশ্চ গমনোদ্যত হইতেছে, এমন সময় রাজীব চমকিয়া উঠিয়া কহিল, “চাটুয্যোমহাশয়!”

মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমুখে আসিতেছে, বুঝিল তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভগ্নভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। মহামায়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিল-- কেবল একবার নীরবে নিস্তব্ধভাবে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, “রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইবা তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।”

ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল-- আর, রাজীব হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল-- যেন তাহার ফাঁসির ছকুম হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রেই ভবানীচরণ একখানা লাল চেলি আনিয়া মহামায়াকে বলিলেন, “এইটে পরিয়া আইস।”

মহামায়া পরিয়া আসিল। তাহার পর বলিলেন, “আমার সঙ্গে চলো।”

ভবানীচরণের আদেশ, এমন-কি, সংকেতও কেহ কখনো অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাত্রে উভয়ে নদীতীরে শ্মশান-অভিमुखে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দূর নহে। সেখানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারই শয্যাপার্শ্বে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোণে পুরোহিত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবিলম্বে শুভানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল ; মহামায়া বুঝিল, এই মুমূর্ষুর সহিত তাহার বিবাহ। সে আপত্তির লেশমাত্রও প্রকাশ করিল না। দুইটি অদূরবর্তী চিতার আলোকে অন্ধকারপ্রায় গৃহে মৃত্যুযন্ত্রণার আতঁধ্বনির সহিত অস্পষ্ট মন্তোচ্চারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

যেদিন বিবাহ তাহার পরদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দুর্ঘটনায় বিধবা অতিমাত্র শোক অনুভব করিল না-- এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাৎ বিবাহসংবাদে যেরূপ বজ্রাহত হইয়াছিল, বৈধব্যসংবাদে সেইরূপ হইল না। এমন-কি, কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে-ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল

না। দ্বিতীয় আর-একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, শ্মশানে আজ ভারি ধূমা মহামায়া সহমৃত্যু হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহায্যে এই নিদারুণ ব্যাপার বলপূর্বক রহিত করিবো। তাহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজই বদলি হইয়া সোনাপুরে রওনা হইয়াছে-- রাজীবকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু রাজীব একমাসের ছুটি লইয়া থাকিয়া গেছে।

মহামায়া তাহাকে বলিয়াছে, “তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো” সে কথা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপাতত এক মাসের ছুটি লইয়াছে, আবশ্যক হইলে দুই মাস, ক্রমে তিন মাস-- এবং অবশেষে সাহেবের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবে না।

রাজীব যখন পাগলের মতো ছুটিয়া হয় আত্মহত্যা নয় একটা-কিছু করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যাকালে মুঘলধারায় বৃষ্টির সহিত একটা প্রলয়-ঝড় উপস্থিত হইল। এমনি ঝড় যে রাজীবের মনে হইল, বাড়ি মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবো। যখন দেখিল বাহ্য প্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনোরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পরিত না, প্রকৃতি আকাশপাতাল জুড়িয়া ততটা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।

এমন সময়ে বাহির হইতে সবলে কে দ্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্রে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ঘোমটা। রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া।

উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?”

মহামায়া কহিল, “হাঁ। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিবা। সেই অঙ্গীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বলো, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিবা। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনো আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না-- তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।

মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেষ্ট, তখন আর-সমস্তই তুচ্ছধ্বনি হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল, “তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিয়ো-- আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আর আমি বাঁচিব না।”

মহামায়া কহিল, “তবে এখনই চলো-- তোমার সাহেব যেখানে বদলি হইয়াছে, সেইখানে যাই।”

ঘরে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এমনি ঝড় যে দাঁড়ানো কঠিন-- ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটাগুলির মতো গায়ে বিঁধিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙিয়া পড়িবার ভয়ে, পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগ পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গল্পটা পাঠকেরা নিতান্ত অমূলক অথবা অলৌকিক মনে করিবেন না। যখন সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

মহামায়ার হাতপা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমর্পণ করিয়া যথাসময়ে অগ্নিপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। অগ্নিও ধূ ধূ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় ও মুঘলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রীর ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টিতে

চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভঙ্গ হইয়া তাহার হাতদুটি মুক্ত হইয়াছে। অসহ্য দাহযন্ত্রণায় একটিমাত্র কথা না কহিয়া, মহামায়া উঠিয়া বসিয়া পায়ের বন্ধন খুলিল। তাহার পর, স্থানে স্থানে দক্ষ বস্ত্রখণ্ড গাত্রে জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে কেহই ছিল না, সকলেই শ্মশানো প্রদীপ জ্বালিয়া একখানি কাপড় পরিয়া মহামায়া একবার দর্পণে মুখ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কী ভাবিল। তাহার পর মুখের উপর দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া অদূরবর্তী রাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কী ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানিমাাত্র ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোমটাটুকু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনাকে কালক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু এই ঘোমটার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোমটার ভিতরকার নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ দুঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব পূর্বে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব সুন্দর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোমটাচ্ছন্ন মূর্তি চিরদিন পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে-- বিশেষত মহামায়া পুরাণবর্ণিত কর্ণের মতো সহজকবচধারী-- সে আপনার স্বভাবের চারিদিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পর মাঝে আবার যেন আর-একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরো একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে। অহরহ পার্শ্বে থাকিয়াও সে এতদূরে চলিয়া গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না--

কেবল একটা মায়াগণ্ডির বাহিরে আসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সুস্মান অথচ অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে-- নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশিযাপন করে।

এমনি করিয়া এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিষ্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শাস্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রূপার পাতের মতো ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে-- বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কী ভাবিল জানি না কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মতো উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল। মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল-- মুখ নত করিয়া দেখিল-- মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায়, এ কী! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়। চিতানলশিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অব্যক্ত ধ্বনিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল-- দেখিল সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া শয্যা ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া

দাঁড়াইল। রাজীব বুঝিল, এইবার বজ্র উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল-- পায়ে ধরিয়া কহিল, “আমাকে ক্ষমা করো”

মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া, মুহূর্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।

ফাল্গুন, ১২৯৯

দানপ্রতিদান

বড়োগিন্দি যে কথাগুলো বলিয়া গেলেন, তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে-হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন, তাহার চিত্তপুত্তলি একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষত, কথাগুলো তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলা-- এবং স্বামী রাধামুকুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বুলের সহিত তাম্রকূটধূম সংযোগ করিয়া খাদ্যপরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলো শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল, এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাভীরের সহিত তাম্রকূট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমত যথাকালে শয়ন করিতে গেলেন।

কিন্তু এরূপ অসামান্য পরিপাকশক্তি সকলের নিকট প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রাসমণি আজ শয়নগৃহে আসিয়া স্বামীর সহিত এমন ব্যবহার করিল, যাহা ইতিপূর্বে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যদিন শান্তভাবে শয্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত হইত, আজ একেবারে সবেগে কঙ্কণঝংকার করিয়া স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিছানার একপাশে শুইয়া পড়িল এবং ক্রন্দনাবেগে শয্যাতেল কম্পিত করিয়া তুলিল।

রাধামুকুন্দ তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকাণ্ড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ঔদাসীনে স্ত্রীর অধৈর্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদুগভীর স্বরে জানাইলেন যে, তাঁহাকে বিশেষ কার্যবশত ভোরে উঠিতে হইবে, এক্ষণে নিদ্রা আবশ্যিক।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমণির ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মুহূর্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইয়াছে?”

রাসমণি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন, “শোন নাই কি?”

“শুনিয়াছি কিন্তু বউঠাকরুন একটা কথাও তো মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অগ্নেই প্রতিপালিত নহি। তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র এ-সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি যে খাইতে পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে, তাহাও খাওয়াপরার শামিল করিয়া লইতে হয়।”

“এমন খাওয়াপরায় কাজ কী”

“বাঁচিতে তো হইবো”

“মরণ হইলেই ভালো হয়।”

“যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করো, আরাম বোধ করিবো” বলিয়া রাধামুকুন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট-সম্পর্কও নয় ; প্রায় গ্রামসম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড়োগিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত। বিশেষত, শশিভূষণ দেওয়াথোওয়া সম্বন্ধে ছোটোবউয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে-জিনিসটা নিতান্ত একজোড়া না মিলিত, সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোটোবউকেই দিতেন। তাহা ছাড়া, অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধামুকুন্দের পরামর্শের প্রতি বেশি নির্ভর করিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়কর্মের সমস্ত ভার রাধামুকুন্দের উপরেই ছিল। বড়োগিন্নির সর্বদাই সন্দেহ, রাধামুকুন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে-- তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত। মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এইজন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাঁহার প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপূর্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ দৃঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহুযত্নপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্প-সহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।

রাত্রে রাধামুকুন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না-- কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরসমুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাধে, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন। অসুখ হয় নাই তো?”

রাধামুকুন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, “দাদা, আর তো আমার এখানে থাকা হয় না” এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড়োগৃহিণীর আক্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন, “এই! এ তো নূতন কথা নহে ও তো পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কথা আমাকেও তো মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া তো সংসার ত্যাগ করিতে পারি না”

রাধা কহিলেন, “মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কী করিতে কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে”

শশিভূষণ কহিলেন, “তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি”

আর অধিক কথা হইল না। রাধামুকুন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এদিকে বড়োগৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষে যখন-তখন তিনি রাধাকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না; মুহূর্মুহু বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাআকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধা যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তো আজিকার নহে-- দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাততাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা

হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসির নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিত যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত-- তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি। জীবনের এতগুলো দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরাম্প্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ, এরূপ সন্দেহ এরূপ আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কী হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে গবর্মেন্টের খাজনা শোধ না করিলে জমিদারি সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল, শশিভূষণের একমাত্র জমিদারি পরগণা এনাংশাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধামুকুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন, “আমারই দোষ।”

শশিভূষণ কহিলেন, “তোমার কিসের দোষ। তুমি তো খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাত পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কী করিতে পারা”

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোনো ফল নাই-- এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোনো কাজকর্মে হাত দিবেন, সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া একমুহূর্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধামুকুন্দ এক থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক

নির্ভর করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধামুকুন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল, এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামুকুন্দ পূর্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবর্তী শহরে সে মোজ্জারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোজ্জারি ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জেলার অধিকাংশ বড়ো বড়ো জমিদারের কার্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অগ্নেই শশিভূষণ এবং ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে-কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোনো গর্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোনো একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল, বোধ করি দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোনো-একটা বিষয়ে বড়োগিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমত কাজ করিয়াছিল-- কিন্তু সে কেবল একটিদিন মাত্র-- তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কানে গিয়াছিল, এবং রাত্রে রাধামুকুন্দ কী কী যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর ‘রা’ রহিল না, বড়োগিন্নির দাসীর মতো হইয়া রহিল-- শুনা যায়, রাধামুকুন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সপ্তাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই-- অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনিতি করিয়া দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন, এবং বলেন, “ছোটোবউ তো সেদিন আসিয়াছে, আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি, ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ করো”

রাধামুকুন্দ সংসারখরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যিক ব্যয় নিয়ম-অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড়োগিন্নির অবস্থা পূর্বাপেক্ষা ভালো বৈ মন্দ

নহে, কারণ পূর্বেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেকসময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না, কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন ক্শ হইয়া যাইতেছিলেন। আর-কেহ তাহা ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেকসময় গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রত হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধামুকুন্দ অনেকসময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিত, “তোমার কোনো ভাবনা নাই, দাদা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব-- কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশিদিন দেরিও নাই”

বাস্তবিক বেশিদিন দেরিও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে-ব্যক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারির কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদরখাজনা দিতে হইত-- একপয়সা মুনাফা পাইত না। রাধামুকুন্দ বৎসরের মধ্যে দুই-একবার লাঠিয়াল লইয়া লুটপাট করিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত। প্রজারাও তাহার বাধ্য ছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যবসাজীবী জমিদারকে তাহার মনে মনে ঘৃণা করিত এবং রাধামুকুন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারী বিস্তর মকদ্দমা-মামলা করিয়া বারবার অকৃতকার্য হইয়া এই ঝঞ্জাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধামুকুন্দ সেই পূর্ব সম্পত্তি পুনর্ব্বার কিনিয়া লইলেন।

লেখায় যত অল্পদিন মনে হইল, আসলে ততটা নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্বপ্রাপ্তে প্রৌঢ়বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন, কিন্তু এই আট দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তররুদ্ধ মানসিক উত্তাপের বাষ্পখানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন, তখন কী জানি কেন, আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। বহুদিন অব্যবহারে

হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিফল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলেও টিলা হইয়া না মিয়া যায়-- সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী বল, ভাই”

রাধামুকুন্দ বলিলেন, “অবশ্য, শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈকি”

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোটোবড়ো সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখীকাঙালগণ পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেশনাদি বিবিধ কার্যে তিন-চারিদিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাহার ভগ্ন শরীরে আর সহিল না-- তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল-- বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল, “বড়ো শক্ত ব্যাধি”

রাত্রি দুই-তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধামুকুন্দ কহিলেন, “দাদা, তোমার অবর্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব, সেই উপদেশ দিয়া যাও”

শশিভূষণ কহিল, “ভাই, আমার কী আছে যে কাহাকে দিব”

রাধামুকুন্দ কহিলেন, “সবই তো তোমारा”

শশিভূষণ উত্তর দিলেন, “এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে”

রাধামুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা-দুটি ধরিয়া কহিল, “দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আর তো সময় নাই”

শশিভূষণ কোনো উত্তর করিলেন না-- রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন-- সেই স্বাভাবিক শাস্ত্যাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল, “দাদা, আমার ভালো করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই মনের যথার্থ যে-ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে তো, হয়তো তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল-- তুমি ধনী, আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম এই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সেই প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদরখাজনা লুট করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম”

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, “ভাই, ভালোই করিয়াছিলো কিন্তু যেজন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল। কাছে কি রাখিতে পারিলে। দয়াময় হরি!” বলিয়া প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাধামুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল, “দাদা, মাপ করিলে তো?”

শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, “ভাই, তবে শোনো। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে।

আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি”

রাধামুকুন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কহিল, “দাদা, মাপ যদি করিয়াছ, তবে তোমার এই সম্পত্তি তুমি গ্রহণ করো। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়ো না”

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না-- তখন তাঁহার বাকরোধ হইয়াছে--
রাধা-মুকুন্দের মুখের দিকে অনিমেঘে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত
তুলিলেন। তাহাতে কী বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধকরি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া
থাকিবো।

ঐত্র, ১২৯৯